শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের

নিষ্কৃতি



শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯



নিষ্কৃতি

এক

ভবানীপুরের চাটুয্যেরা একান্নবর্তী পরিবার। দুই সহোদর গিরীশ ও হরিশ এবং খুড়তুতো ছোট ভাই রমেশ। পূর্বে ইহাদের পৈতৃক বাটী ও বিষয়-সম্পত্তি রূপনারায়ণ নদের তীরে হাওড়া জেলার ছোট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ছিল। তখন গিরীশের পিতা ভবানী চাটুয্যের অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু, হঠাৎ এক সময়ে রূপনারায়ণ এমনি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ভবানীর জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান গিলিতে শুরু করিলেন যে, বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। অবশেষে, সাতপুরুষের বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া এই ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া নিজের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী সপরিবারে পলাইয়া আসিয়া ভবানীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে-সব অনেক দিনের কথা। তাহার পর গিরীশ ও হরিশ উভয়েই উকীল

হইয়াছেন, বিস্তর বিষয়-আশয় অর্জন করিয়াছেন, বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন—এক কথায়, যাহা গিয়াছিল তাহার চতুর্গুণ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এখন বড়ভাই গিরীশের বাৎসরিক আয় প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা, হরিশও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উপায় করেন, শুধু করিতে পারে নাই রমেশ। তবে একেবারে যে কিছুই পারে নাই তাহা নহে। বার দুই-তিন সে আইন ফেল করিতে পারিয়াছিল এবং সম্প্রতি কি-একটা ব্যবসায়ে বড়দার হাজার তিন-চার লোকসান করিয়া এইবার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে দেশ-উদ্ধারে রত হইয়াছিল।

কিন্তু, এতদিনের এক সংসার এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহার কারণ, মেজবৌ ও ছোটবৌয়ে কিছুতেই আর বনিবনাও হয় না। হরিশ এতকাল কলিকাতায় থাকিতেন না, সপরিবারে মফস্বলে থাকিয়া প্র্যাকটিস করিতেন। তখন মাঝে মাঝে দু-দশদিনের বাড়ি আসা-যাওয়ার অল্প সময়টুকু এই দুটি নারীর বিশেষ সদ্ভাবে না কাটিলেও কলহ-বিবাদের এরূপ প্রচুর অবসর ছিল না। প্রায় মাসখানেক হইল হরিশ সদরে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি করিতেছেন এবং বাড়ি হইতে সুখশান্তিও পলাইবার উপক্রম করিয়াছে। তবে এবার আসিয়া পর্যন্ত দুই জায়ের মনকষাকষি ব্যাপার এখনও উঁচু পর্দায় উঠে নাই ; তাহার কারণ ছোটবৌ এতদিন এখানে ছিল না। রমেশের স্ত্রী শৈলজা তাহার একমাত্র পুত্র পটল ও সপত্নী-পুত্র কানাইলালকে বড়জার হাতে রাখিয়া মরণাপন্ন বাপকে দেখিতে কৃষ্ণনগর গিয়াছিল। বাপ আরোগ্য হইয়াছেন, সেও দিন পাঁচ-ছয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাড়িতে শাশুড়ি এখনও বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু বড়বধূ সিদ্ধেশ্বরীই যথার্থ গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতিটা ঠিক বুঝা যাইত না, এইজন্যই বোধ করি পাড়ায় তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুই-ই একটু অতিমাত্রায় ছিল।

সিদ্ধেশ্বরীর দরিদ্র পিতামাতাকে তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। গত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহারা অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া এবার পূজার সময় মেয়েকে বাড়ি লইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী সংসার ফেলিয়া বেশী দিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না, মাসখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কাটোয়ার ম্যালেরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অথচ, বাড়ি আসিয়া অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। তেমনিই প্রাতঃস্নান চলিতে লাগিল এবং কিছুতেই কুইনিন সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। অতএব ভুগিতেও লাগিলেন। দুই-চারি দিন যায়—জ্বরে পড়েন, অবার উঠেন আবার পড়েন। ফলে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন—এমনি সময়ে শৈল বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি শুরু করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে বড়বধূর কাছেই আছে, এজন্য সে যত জোর করিতে পারিত, মেজবৌ কিংবা আর কেহ তাহা পারিত না। আরও একটা কারণ ছিল। মনে মনে সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে ভারী ভয় করিতেন। শৈল অত্যন্ত রাগী মানুষ এবং এমনি কঠোর উপবাস করিতে পারিত যে, একবার শুরু করিলে কোন উপায়েই তাহাকে জলস্পর্শ করানো যাইত না—এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর সর্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠার হেতু ছিল।

শৈলর মাসীর বাড়ি পটলডাঙ্গায়। এবার কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া অবধি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই। আজ একাদশী, শাশুড়ীর রান্নার কাজ নাই—তাই সকালেই সিদ্ধেশ্বরীর মেজছেলে হরিচরণের উপর মাকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার দিয়া সে পটলডাঙ্গায় গিয়াছিল।

শীতকাল। ঘন্টা-দুই হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। কাল প্রভাত হইতেই সিদ্ধেশ্বরীর ভালো করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টায় তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জীবের মত তাঁহার অতি প্রশস্ত শয্যার একাংশে শুইয়াছিলেন এবং এই শয্যার উপরেই তিন চারিটি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল প্রদীপের আলোকের সম্মুখে বসিয়া ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল—অর্থাৎ বই খুলিয়া হাঁ করিয়া হুড়োহুড়ি দেখিতেছিল। ওধারে শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জ্বালিয়া চিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছিল। বোধ করি পাসের পড়া তৈরি করিতেছিল, কারণ এত গণ্ডগোলেও তাহার লেশমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছিল না। যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল ইহারা সকলেই মেজকর্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আমার ডানদিকে শোবার পালা, না বড়মা ?

কিন্তু বড়মা জবাব দিবার পূর্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিয়া বলিল, না বিপিন, তুমি না। বড়মার ডানদিকে আমি শোব যে।

বিপিন প্রতিবাদ করিল, তুমি কাল শুয়েছিলে যে মেজদা?

কাল শুয়েছিলাম? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ তবে বাঁদিকে।

যেই বলা, অমনি পটলের ক্ষুদ্র মস্তক লেপের ভিতর হইতে উঁচু হইয়া উঠিল, সে এতক্ষণ প্রাণপণে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁদিক ঘেঁষিয়া পড়িয়াছিল। বেদখল হইবার সম্ভাবনায় অমন হুড়োমুড়িতে পর্যন্ত যোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমি এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি যে!

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, পটল! বড়ভায়ের সঙ্গে তর্ক করো না বলচি। মাকে বলে দেব।

পটল বেচারা অত্যন্ত বেগতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাইমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, বড়মা, আমি কখন থেকে শুয়ে আছি যে!

কানাই ছোটভাইয়ের স্পর্ধায় চোখ পাকাইয়া 'পটল' বলিয়া গর্জিয়া উঠিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

ঠিক এইসময়ে ঘরের বাহিরের বারান্দার একপ্রান্ত হইতে শৈলজার কণ্ঠস্বর আসিল, ওরে বাপ রে! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েচে!

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্তন! ও-বিছানায় হরিচরণ পাঠ্যপুস্তকটা ধাঁ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া দিয়া এবার বোধ করি একখানা অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—চোখে তাহার জ্বলন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁদিক ডানদিকের সমস্যা আপাততঃ নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল—'যে বিস্তীর্ণ জলরাশি—', আর সবচেয়ে আশ্চর্য ওই শিশুর দলটি! ভোজবাজির মত কোথায় তাহারা যে একমুহূর্তে অন্তর্ধান হইয়া গেল তাহার চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না। শৈলজা কলিকাতা হইতে এইমাত্র ফিরিয়া বড়জার জন্য একবাটি গরম দুধ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কানাইলালের 'মহাসমুদ্রের গভীর কল্লোল' ব্যতীত ঘর সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ওদিকে হরিচরণ এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে, তাহার পিঠের উপর দিয়া হাতি চলিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিত না। কারণ ইতিপূর্বে সে 'আনন্দমঠ' পড়িতেছিল। তাহার ভবানন্দ জীবানন্দ ছোটখুড়ীমার আকস্মিক শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের কসরতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কিনা এবং তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, ওরে ওই 'বিস্তীর্ণ জলরাশি' এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত-কণ্ঠে চিঁচিঁ করিয়া বলিল, আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

কারণ ইহারাই তাহার বাঁদিক ডানদিকের মকদ্দমায় প্রধান শত্রু। সে অসঙ্কোচে এই দুটি নিরপরাধীকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিল, কাউকে ত দেখচি না, এরা সব পালাল কোথা দিয়ে?

এবারে কানাই বিপুল উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল, কেউ পালায় নি মা, সব ঐ নেপের মধ্যে ঢুকেচে।

তাহার কথা ও মুখচোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিল। দূর হইতে সে ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিল। এবার বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, খেয়ে ফেললে যে তোমাকে! হাত তোমার না ওঠে, একবার ধমকাতেও কি পার না? ওরে, ওই সব ছেলেরা—বেরো—চল্ আমার সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, এখন মৃদু কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, ওরা নিজের মনে খেলা কচ্চে, আমাকে বা খেয়ে ফেলবে কেন, আর তোর সঙ্গেই বা যাবে কেন? না না, আমার সামনে কাউকে তোর মারধর কত্তে হবে না! যা, তুই এখন থেকে—লেপের ভেতর ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠচে।

শৈলজা একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি কি শুধুই মারধর করি দিদি?

বড্ড করিস শৈল। ছোট বোনের মত তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বলিলেন, তোকে দেখলে ওদের মুখ যেন কালিবর্ণ হয়ে যায়—আচ্ছা যা না বাপু তুই সুমুখ থেকে—ওরা বেরুক।

নয়নতারা পুত্রের হুঁশিয়ারি সম্বন্ধে কি-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই শৈল গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার জ্যাঠামো করতে হবে না বাবা, তুমি নিজের চরকা তেল দাও গে। ওদের জামা তৈরি করবার লোক আছে। বলিয়া আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারা সক্রোধে বলিল, দিদি, ছোটবোর কথা শুনলে ? কেন, কি অন্যায় কথাটা অতুল বলেচে শুনি ?

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না। বোধ করি, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তাই শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু শৈল শুনিতে পাইল। সে দুপা পিছাইয়া আসিয়া মেজজায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছোটবোর কথা দিদি অনেক শুনেচে—তুমিই শোননি। অতুল ছোটভাই হয়ে হরিকে যেমন করে ভ্যাঙালে, আর তুমি খিলখিল করে হাসলে—ও আমার পেটের ছেলে হলে আজ ওকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘরসুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে নয়নতারা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, আজ আমার অতুলের জন্মবার, আর ছোটবৌ যা মুখে এল তাই বলে তাকে গাল দিয়ে গেল !

সিদ্ধেশ্বরী দুই জায়ের কলহের সূচনায় নিঃশব্দে সভয়ে ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন।

নয়নতারা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিল, তুমি নিজে কিছু না করে দিলে আমাদেরই যা হোক একটা উপায় করে নিতে হবে।

তথাপি সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না। তখন নয়নতারা ছেলেকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু মিনিট-দশেক পরে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক সারিয়া গাত্রোত্থান করিতেই মেজবৌ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কবাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী সভয়ে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মেজবৌ ?

নয়নতারা কহিল, সেই কথাই জানতে এসেছি। আমি কারুর খাইনে পরিনে দিদি যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে ঝাঁটা খাবো।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিনীতভাবে বলিলেন, ঝাঁটা মারবে কেন মেজবৌ, ওর ঐরকম কথা। তা ছাড়া তোমাকে ত বলেনি, শুধু—

শুধু অতুলকে জ্যান্ত পুঁততে চেয়েছিল। আর আমি খিলখিল করে হাসি ! শাগ দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি—আবার ঝ্যাঁটা লোকে কি করে মারে ? ধরে মারেনি বলে বুঝি তোমার মন ওঠেনি ?

সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া গেলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, ও কি কথা মেজবৌ ? আমি কি তাকে শিকিয়ে দিয়েচি ?

মেজবৌ চাবির ব্যাপার হইতেই অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছিল, উদ্ধতভাবে জবাব দিল, সে তুমিই জানো। কেউ কারো মন জানতে যায় না দিদি, চোখে দেখে, কানে শুনেই বলতে হয়। আমরা নূতন লোক, তোমার সংসারে এসে পড়ে যদি আপদ-বালাই হয়ে থাকি, বেশ ত, তুমি নিজে বললেই ত ভাল হয়, আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন ?

এ অভিযোগের উত্তর সিদ্ধেশ্বরীর মুখে যোগাইল না, তিনি বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন।

মেজবৌ অধিকতর কঠোরস্বরে কহিল, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না তাড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় করলেই ত দেখতে শুনতে ভাল হয়, আমরাও স-মানে চলে যাই। উঃ—উনি শুনলে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন। যাকে তাকে বলে বেড়ান, আমাদের বৌঠাকরুন মানুষ নয়—সাক্ষাৎ ঠাকুরদেবতা !

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধস্বরে বলিলেন, এমন অপবাদ আমার শত্তুরেও দিতে পারে না মেজবৌ ! এ-সব কথা ঠাকুরপোকে শোনানোর চেয়ে আমার মরণ ভাল। তোমরা এসেচ বলে আমার কত আহ্লাদ—আমার কানাই পটলকে আনো, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে—

কথাটা শেষ হইল না। শৈল একবাটি দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আহ্নিক হয়েচে ? একটু দুধ খাও দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোর যা মুখে আসবে তাই লোককে বলবি কেন ?

কাকে কি বলেচি ?

সিদ্ধেশ্বরী এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, তেমনি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে বলে বলে তোর বুক বেড়ে গেছে—কে তোর কথার ধার ধারে লা ? সবাইকে তুই দিদি পেয়েচিস ? দূর হ আমার সুমুখ থেকে।

শৈল সহজভাবে বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, দুধ খেয়ে নাও, আমি যাচ্ছি। এ বাটিটায় আমার দরকার।

তাহার নিরুদ্বিগ্ন কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন, খাবো না, কিচ্ছু খাবো না, তুই যা। হয় তুই বাড়ি থেকে বেরো, না হয় আমি বেরোই—দুটোর একটা না করে আমি জলস্পর্শ করব না।

শৈল তেমনি সহজ গলায় বলিল, আমি এইসেদিন এসেচি দিদি এখন যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং তুমিই গিয়ে আর দিনকতক কাটোয়ায় থাক গে—কাছেই গঙ্গা—আচ্ছা মেজদি, কি তুচ্ছ কথা নিয়ে সকালবেলা তোলপাড় ক'চ্চ বল ত ? জ্বরে জ্বরে দিদি আধমরা হয়ে রয়েছে, ওঁকে কেন বিঁধচ ? আমি যদি দোষ করে থাকি, আমাকে বললেই ত হয়—কি হয়েচে বল ?

সিদ্ধেশ্বরী চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিলেন, আজ অতুলের জন্মদিন, কেন তুই বাছাকে অমন কথা বললি ?

শৈল হাসিয়া উঠিল, ওঃ, এই ! কিছু ভয় করো না মেজদি—তোমার মত আমিও ত মা। আমার হরিচরণ, কানু, পটল যেমন, অতুলও তেমনি। মায়ের কথায় গাল লাগে না মেজদি ; আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আশীর্বাদ করছি—নাও দিদি, তুমি খেয়ে নাও, আমি কড়া চড়িয়ে এসেচি।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কান্নার সঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আচ্ছা, তোর মেজদির কাছেও ঘাট মান, তুই তাকেও মন্দ বলেচিস।

আচ্ছা মানচি, বলিয়া শৈল তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাত দিয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া কহিল, যদি অন্যায় করে থাকি মেজদি, মাপ কর—আমি ঘাট মানচি।

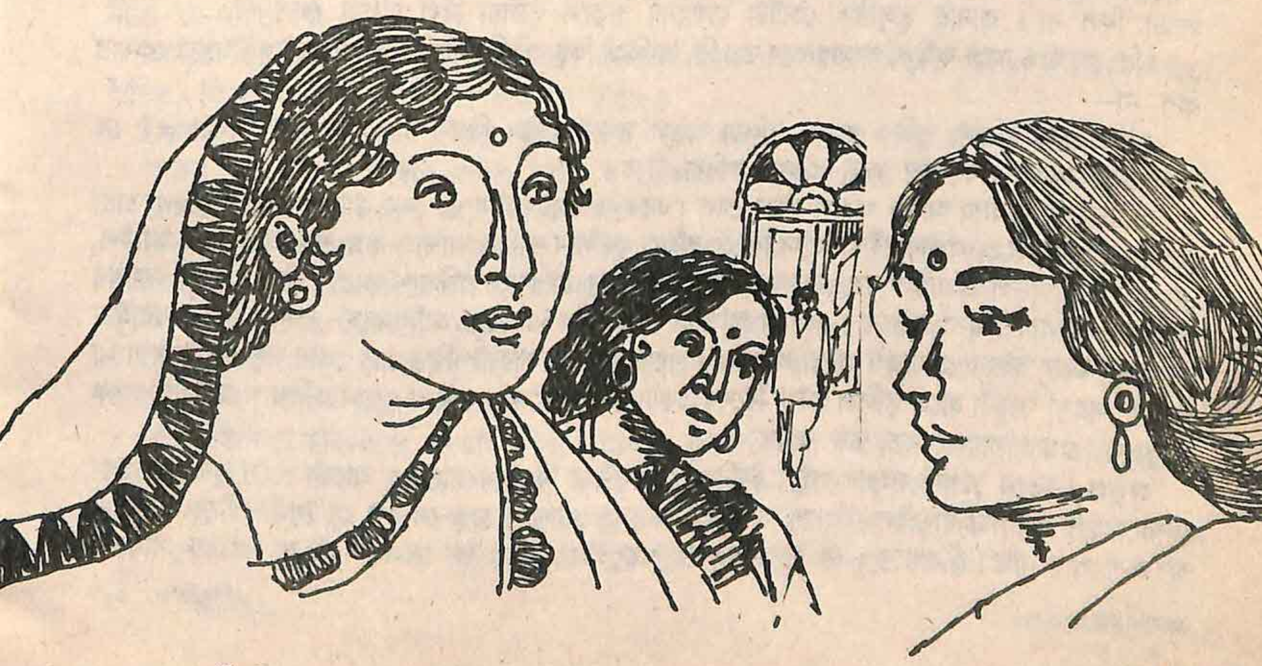
নয়নতারা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরীর বুকের ভারী বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্নেহে আনন্দে গলিয়া গিয়া নয়নতারার মত ছোটজায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া মেজজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ পাগলীর কথায় কোনদিন রাগ করো না মেজবৌ। এই আমাকেই দেখ না—ওকে বকি-ঝকি কত গালমন্দ করি ; কিন্তু একদণ্ড দেখতে না পেলে বুকের ভেতরে কি যেন আঁচড়াতে থাকে—এত দুধ ত খেতে পারব না দিদি ?

পারবে, খাও।

সিদ্ধেশ্বরী আর তর্ক না করিয়া জোর করিয়া সমস্তটা খাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, এক্ষণি বাছাকে ডেকে আশীর্বাদ করিস শৈল।

এক্ষণি করচি, বলিয়া শৈল হাসিয়া খালি বাটিটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।





তিন

অতুল এমন অপ্রস্তুত জীবনে হয় নাই। শৈশব হইতে আদরযত্নে লালিত পালিত ; বাপ-মা কোনদিন তাহার ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধে কথা কহিতেন না। আজ সকলের সম্মুখে এত বড় অপমান তাহার সর্বাঙ্গ বেড়িয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে বাহিরে আসিয়া নূতন কোটটা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিল।

আজ হরিচরণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল অতুলের উপর। কারণ, তাহারই ওকালতি করিতে গিয়া সে লাঞ্ছিত হইয়াছে—তাই সেও তাহার পাশে আসিয়া মুখ ভারী করিয়া বসিল। ইচ্ছাটা—তাহাকে সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু সময়োপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া মৌন হইয়া রহিল।

কিন্তু অতুলের আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। কারণ, অপমানটাই এ ক্ষেত্রে তাহার একমাত্র ক্ষোভের বস্তু নয়, সে বিদেশ হইতে অনেক ফ্যাশন, অনেক কোট-প্যান্ট নেক্‌টাই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, নানা রকমে অনেক উঁচুতে তুলিয়া নিজের আসন বাঁধিয়াছে, আজ ছোটখুড়ীমার একটা তিরস্কারের ধাক্কায় অকস্মাৎ সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া যায় দেখিয়া সে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিদাকে উদ্দেশ করিয়া সরোষে বলিল, আমি কারো কথার ধার ধারিনে বাবা ! এ শর্মা অতুলচন্দ্র,—রেগে গেলে ও-সব ছোটখুড়ী-টুড়ী কাউকে কেয়ার করে না !

হরিচরণ এদিকে ওদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে প্রত্যুত্তর করিল, আমিও করিনে—চুপ, কানাই আসছে। পাছে নির্বোধ অতুল উহারই সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বসে এই ভয়ে সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কানাই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া মোগল-বাদশার নকিবের মত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া কহিল, মেজদা, সেজদা, মা ডাকচেন—শিগগির।

হরিচরণ পাংশুমুখে কহিল, আমাকে ? আমি কি করেচি ? আমকে কখ্‌খন নয়—যাও অতুল, ছোটখুড়ীমা ডাকচেন তোমাকে।

কানাই প্রভুত্বের স্বরে কহিল, দুজনকেই—দুজনকেই—এক্ষুণি—অ্যাঁ, সেজদা, তোমার নতুন কোট মাটিতে ফেলে দিলে কে ?

প্রত্যুত্তরে সেজদা শুধু মেজদার মুখের পানে চাহিল, এবং মেজদা সেজদার মুখের পানে চাহিল, কেহই সাড়া দিল না। কানাই ভূলুণ্ঠিত কোটটা চেয়ারের হাতলে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরিচরণ শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, আমার আর ভয় কি, আমি ত কিছু বলিনি—তুমিই বলেচ ছোটখুড়ীমাকে কেয়ার কর না—

আমি একা বলিনি, তুমিও বলেচ, বলিয়া অতুল সগর্বে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। ভাবটা এই যে আবশ্যক, হইলে সে সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।

হরিচরণের চেহারা আরও খারাপ হইয়া গেল। একে ত ছোটখুড়ীমা যে কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জানা নেই, তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অতুল কি যে বলিয়া ফেলিবে তাহাও আন্দাজ করা শক্ত। একবার ভাবিল, সেও পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্বপ্রকার নালিশের রীতিমত প্রতিবাদ করে। কিন্তু, কিছুই তাহার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া ভরসা হইলনা। এদিকে হাজিরির সময় নিকটর হইয়া আসিতেছে—কানাই শমন ধরাইয়া গিয়াছে, এবার নিশ্চয় ওয়ারেন্ট লইয়া আসিবে। হরিচরণ আত্মরক্ষার উপস্থিত আর কোন সদুপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, সহসা গাড়ুটা হাতে তুলিয়া লইয়া বিশেষ একটা স্থানের উদ্দেশে সবেগে প্রস্থান করিল। ছোটখুড়ীমাকে বাড়িসুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করিত।

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া সংবাদ লইয়া জানিল, ছোটখুড়ীমা নিরামিষ-রান্নাঘরে আছেন। সে বুক ফুলাইয়া দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ বাটীর অন্যান্য ছেলেদের মত সে এই ছোটখুড়ীমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই। স্ত্রীলোকেও যে ইস্পাতের মত শক্ত হইতে পারে ইহা সে জানিতই না। অথচ সাধারণ

দুর্বলচিত্ত ও মৃদু আত্মীয়-আত্মীয়তার কাছে জন্মাবধি প্রশ্রয় পাইয়া তাহার মা, খুড়ি, জ্যাঠাই প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল, ইঁহাদিগের মুখের উপর শুধু কড়া জবাব দিতে পারিলেই কাজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাটা খুব জোরে প্রকাশ করিতে পারা চাই। তাহা হইলেই ইঁহারা সায় দেন, অন্যথা দেন না। যে ছেলে ইহা না পারে তাহাকে চিরকাল ঠকিয়ে মরিতেই হয়। এখানে আসিয়া অবধি সে হরিচরণের বেশভূষার অভাব লক্ষ্য করিয়া এই ফন্দিটা গোপনে তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল। অথচ, এইমাত্র নিজের বেলায় কোন ফন্দিই খাটে নাই, ছোটখুড়ীমার তাড়া-খাইয়া কড়া জবাব ত ঢের দূরের কথা—কোনপ্রকার জবাবই মুখে যোগায় নাই—হতবুদ্ধির মত নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই এখন ফিরিয়া গিয়া সমস্ত অপমান কড়ায়-গন্ডায় শোধ দিবার অভিপ্রায়ে সে অমন মরিয়ার মত রান্নাঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই স্থানটা হইতে শৈলজার মুখের কিয়দংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, এমন কি মুখ তুলিলেই তিনি অতুলকে দেখিতে পাইতেন ; কিন্তু রান্নায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অতুলের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন না, মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু অতুল খুড়ীমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিল নিমিষমাত্র, তথাপি সে অনুভব করিল এ মুখ তাহার মায়ের নয়, জ্যাঠাইমার নয়—এ মুখের সুমুখে দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মত জোর আর যাহরই থাক, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই। তাহার বিস্ফারিত বক্ষ আপনি কুঞ্চিত হইয়া গেল এবং সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এটুকু পর্যন্ত সাহস হইল না—কোনরকম সাড়া দিয়াও ছোটখুড়ীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎ সেজদার পায়ের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া জিভ কাটিয়া দাঁড়াইল, এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া ভীত ব্যাকুল ইঙ্গিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জানাইতে লাগিল, জুতা পায় দিয়া দাঁড়াইবার স্থান ওটা নয়।

ছোটখুড়ীমার আনত-মুখের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া অতুল অন্তরে কন্টকিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করলি নিঃশব্দে সরিয়া যায়, একবার ভাবিল, জুতা-জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ছোটবোনের সুমুখে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। এই নিষেধটা সে যথার্থই জানিত না এবং স্পর্ধাপূর্বক তাহা অমান্যও করে নাই। কিন্তু পিতামাতার কাছে নিরন্তর অবারিত ও অসঙ্গত প্রশ্রয়ে তাহার অভিমান এতই সূক্ষ্ম ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া শেষে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। ভীত-বিবর্ণমুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া নিজের সর্বনাশ উপলব্ধি করিয়াও সে অভিমানী দুর্যোধনের মত সূচ্যগ্র ভূমিও পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

শৈলজা মুখ তুলিল। সস্নেহে মৃদু হাসিয়া বলিল, অতুল এসেচিস ? দাঁড়া বাবা—ও কি রে ! জুতো পায়ে ? নীচে যা—নীচে যা—

বাড়ির আর কোন ছেলে অনুরূপ অবস্থায় শৈলজার হাতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিত, কিন্তু অতুল ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আসতে নেই অতুল, নীচে যাও।

অতুল শুষ্ক মুখে ক্ষীণস্বরে কহিল, আমি ত চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—এখানে দোষ কি ?

শৈলজা ধমকাইয়া উঠিল, দোষ আছে—যাও।

অতুল তথাপি নড়িল না; সে মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, হরিচরণ, কানাই, বিপিন প্রভৃতি আড়াল হইতে তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে। তাই বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, আমরা চুঁচুড়ার বাড়িতে ত জুতো পায়ে দিয়েই রান্নাঘরে যেতুম—এখানে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ালে কিচ্ছু দোষ নেই।

ইহার স্পর্ধা দেখিয়া শৈলজা দুঃসহ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ঠিক এইসময়ে হরিচরণের বড়ভাই মণীন্দ্র ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজিয়া ঘর্মাক্তকলেবরে বাইরে যাইতেছিল। শৈলজার চোখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে খুড়ীমা ?

ক্রোধে শৈলজার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইল না। নীলা দাঁড়াইয়াছিল, অতুলের পায়ের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, সেজদা জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিছুতে নাবছে না।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, এই—নেবে আয়!

অতুল গোঁ-ভরে বলিল, এখানে দাঁড়াতে দোষ কি? ছোটখুড়ী আমাকে দেখতে পারে না বলে শুধু যা যা কচ্চে।

মণীন্দ্র তড়াক করিয়া রকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া অতুলের গণ্ডে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিল, 'ছোটখুড়ী' নয়—'ছোটখুড়ীমা'; 'কচ্চে' নয়—'কচ্চেন'—বলতে হয়—ইতর কোথাকার!

একে মণীন্দ্র পালোয়ান লোক, চড়ের ওজনটাও ঠিক রাখিতে পারে নাই, অতুল চোখে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

মণীন্দ্র ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল। এতটা আঘাত করা সে ইচ্ছাও করে নাই, আবশ্যকও মনে করে নাই। ব্যস্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতদুটা ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিবামাত্রই অতুল ক্রোধোন্মত্ত চিতাবাঘের মত মণীন্দ্রের গায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এমন সকল মিথ্যা সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যাহা হিন্দুসমাজে থাকিয়া, জ্যাঠতুত-খুড়তুত ভায়ের মধ্যে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মণি প্রথমটা বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাসে পড়ে এবং বয়সে ছোট ভাইদের চেয়ে অনেকটাই বড়। তাহারা বড়ভাইয়ের সুমুখে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। এ বাড়িতে ইহাই সে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে। কেহ যে এই-সমস্ত অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে পারে ইহা তাহার কল্পনারও অগোচর। আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না—অতুলের ঘাড় ধরিয়া সজোরে তাহাকে সানের উপর নিক্ষেপ করিয়া, লাথি মারিয়া মারিয়া ঠেলিয়া উপর হইতে প্রাঙ্গণের উপর ফেলিয়া দিল। কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রৈ রৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের মা সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, মেজবধূ নির্জন ঘরে বসিয়া গোটা-দুই সন্দেশ গালে দিয়া জল খাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে নীলবর্ণ হইয়া গেলেন। মুখের সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া, মড়াকান্না তুলিয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া ছেলের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। সমস্তটা মিলিয়া এমনি একটা গণ্ডগোল উঠিল যে, বাহির হইতে কর্তারা কাজকর্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈলজা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, মণি, তুই বাইরে যা। বলিয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিল। মণি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তাহার পিতা মেজবৌমার উন্মাদ ভঙ্গী দেখিয়া লজ্জা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই মহামারী ব্যাপার কতকটা শান্ত হইয়া গেলে, হরিশ ছেলেকে প্রশ্ন করিলেন।

অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে ছোটখুড়ীর প্রতি সমস্ত দোষারোপ করিয়া কহিল ও বড়দাকে মারতে শিখিয়ে দিলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরিশ চীৎকার করিয়া বলিলেন, ছোটবৌমা, মণিকে যে তুমি খুন করতে শিখিয়ে দিলে, কেন শুনি?

নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে ছোটখুড়ীর হইয়া জবাব দিল, সেজদা কথা শোনেন নি, আর বড়দাকে গালাগালি দিয়েচেন, তাই।

নয়নতারা ছেলের তরফ হইতে বলিল, তবে আমিও বলি ছোটবৌ—তোমার হুকুমে ওকে মেরে ফেলছিল বলেই প্রাণের দায়ে ও গাল দিয়েচে, নইলে গাল দেবার ছেলে ত আমার অতুল নয়!

নয়ই ত। বলিয়া সায় দিয়া হরিশ আরও ক্রুদ্ধস্বরে জানিতে চাহিলেন—তোর ছোটখুড়ীকে জিজ্ঞাসা কর্ নীলা, উনি কে যে অতুলকে মারতে হুকুম দেন? কথা যখন ও না শুনেছিল, তখন কেন আমাদের কাছে নালিশ না করা হল? আমরা উপস্থিত থাকতে উনি শাসন করতে গেলেন কেন?

নীলা এই তিনটি প্রশ্নের একটারও উত্তর দিল না।

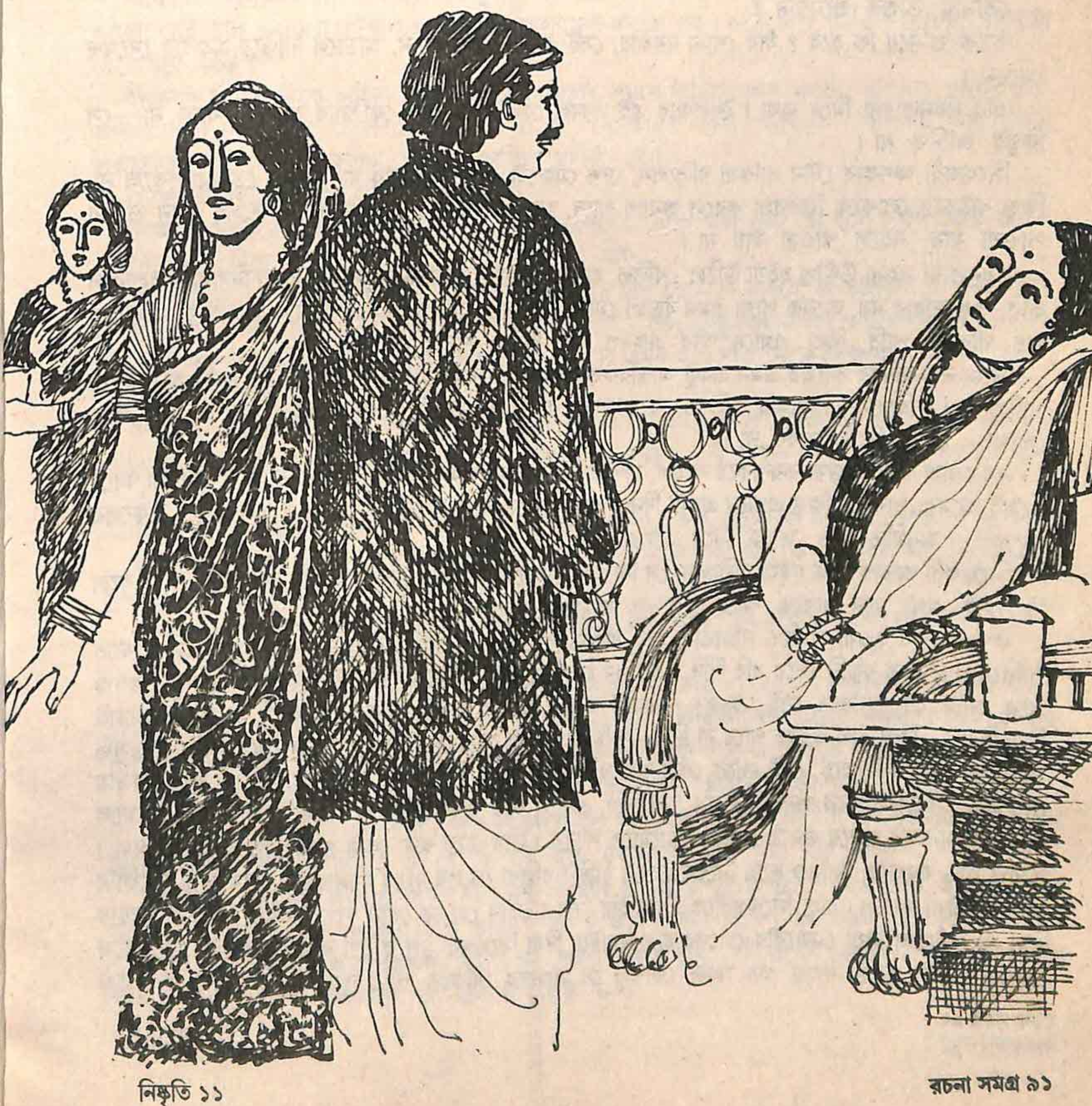
সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ বারান্দার একধারে অবসন্নের মত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়িত দেহে এই উত্তেজনা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল। একে ত, এ সংসারে তিনি ছেলেপুলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না, কারণ তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ভগবান এ বাটীর সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে বড়বধূ এবং গৃহিণী করিয়াও উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই, অথচ শৈলকে সকলের ছোট এবং ছোটবৌ করিয়াও রাশিপ্রমাণ বুদ্ধি দিয়াছেন। হিসাব করিতে, চিঠিপত্র লিখিতে, কথাবার্তা কহিতে, রোগে শোকে চারিদিকে নজর রাখিতে, সকলকে শাসন করিতে, রাঁধিতে-বাড়িতে, সাজাইতে-গুছাইতে ইহার জুড়ি নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শৈল আমার পুরুষমানুষ হইলে এতদিনে জজ হইত। সেই শৈলকে যখন মেজকর্তা

কটূক্তি করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ বোধ করি, ভগবান তাঁহার মাথার মধ্যে গৃহিণীর কর্তব্যবুদ্ধি গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিলেন, বেশ ত মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না করে নিজে শাসন করছ কেন ? মা বেঁচে—মেয়ে বৌকে শাসন করতে হয় আমরা করব ! তুমি পুরুষমানুষ, ভাশুর—ও কি কথা—বাইরে যাও। লোকে শুনলে বলবে কি !

হরিশ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তুমি সবদিকে দৃষ্টি রাখলে ভাবনা কি বৌঠাকরুন। তা হলে কি একজন আর একজনকে বাড়ির মধ্যে হত্যা করে ফেলতে পারে ? বলিয়া বাইরে যাইবার উপক্রম করিতেই তাঁহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন, বেশ ত, দাঁড়িয়ে দেখই না, উনি মেয়ে-বৌকে কেমন শাসন করেন।

হরিশ সে কথার আর জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।



চার

দিন-পাঁচেক পরে সকাল হইতেই মেজগিন্নীদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিনিট-খানেক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, আজ এ-সব কি হচ্চে মেজবৌ।

নয়নতারা উদাসভাবে জবাব দিল, দেখতেই ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি। কোথায় যাওয়া হবে?

নয়নতারা তেমনিভাবে কহিল, যেখানে হোক।

তবু, কোথায় শুনি?

কি করে জানব দিদি, কোথায়? উনি বাসা ঠিক করতে বেরিয়েছেন, ফিরে না এলে ত বলতে পারিনে।

তোমার ভাশুর শুনেচেন?

তাঁকে শুনিয়ে কি হবে? যাঁর শোনা দরকার, সেই ছোটগিন্নী শুনেচেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন।

এটা নয়নতারার মিছে কথা। শৈলজার এই সকাল বেলাটায় নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না—সে কিছুই জানিত না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষণকার মৌন থাকিয়া বলিলেন, দেখ মেজবৌ, এই ভাশুরেরের মান-মর্যাদা তোমরা বুঝলে না, কিন্তু বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই এমন ভাশুর পাওয়া যায়, নইলে পাওয়া যায় না।

নয়নতারা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, আমরা সে কথা কি জানিনে দিদি? দুজন দিবারাত্রি বলাবলি করি, শুধু ভাশুর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড়জা মেলে। তোমার বাড়িতে আমরা ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে চাকরদের মত থাকতে পারি, কিন্তু এখানে আর একদণ্ড বাস করতে পারব না।

আজ নয়নতারার কণ্ঠস্বর এমন একটু আন্তরিকতার আভাস সিদ্ধেশ্বরীর কানে বাজিল যে, তিনি আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, এ আমার বাড়ি ত নয় মেজবৌ, বাড়ি তোমাদেরই। কোনমতেই তোমাদের আমি আর কোথাও যেতে দিতে পারব না।

নয়নতারা ঘাড় নাড়িয়া করুণকণ্ঠে কহিল, যদি কখন ভগবান তেমন দিন দেন দিদি, তা হলে তোমার কাছে এসেই আমরা থাকব; কিন্তু এখানে একটি দিনও আর থাকতে বলো না দিদি। আমার অতুল হয়েচে সকলের চক্ষুশূল; অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে আমরা সরে যাই।

সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, সে কি কথা মেজবৌ? দৈবাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে বলে কি সেই কথা মনে রাখতে আছে? অতুল আমাদের ছেলে—

কথাটা শেষ হওয়া পর্যন্তও নয়নতারা ধৈর্য ধরিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল—কোন কথা মনে রাখতে পারিনে বলে কত বকুনি খেয়ে মরি দিদি। ঐ যখন হলো, তখনই হাউমাউ করে কেঁদেকেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে আমি যে গঙ্গাজল সেই গঙ্গাজল—একটি কথাও আমার স্মরণ থাকে না। আমি ত সমস্ত ভুলেই গিয়েছিলুম; কিন্তু রাগ করতে পাবে না দিদি—তুমি যতই বল, আমাদের ছোটবৌ সহজ মেয়ে নয়! বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শিখিয়ে দিয়েচে, সেই থেকে কেউ আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না। বাছা মুখ চুন করে বেড়ায় দেখেই ত জিজ্ঞেস করে শুনতে পেলুম। না দিদি, এখানে আর থাকা চলবে না। এক বাড়িতে থেকে ছেলে আমার অমন মন গুমরে গুমরে বেড়ালে ব্যামোতে পড়বে। তার চেয়ে অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়াই মঙ্গল। তারও হাড় জুড়োয়, আমিও দুটো নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। বলিয়া ছেলের দুঃখে নয়নতারার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, তাহা সিদ্ধেশ্বরীকেও গলাইয়া দিল। কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। আঁচল দিয়া মেজবৌর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে এতবড় কঠিন শাস্তি দিবার এত সহজ কৌশল যে সংসারে থাকিতে পারে তাহা তিনি কল্পনা করিতেও

পারিতেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাছা রে! বাড়িতে কেউ কি অতুলের সঙ্গে কথা কয় না, মেজবৌ?

নয়নতারা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, জিজ্ঞেস করেই দেখ না দিদি।

হরিচরণকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিয়া সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন। হরিচরণ তেজের সহিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ও ছোটলোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে, মা? বড়দাকে যা মুখে আসে তাই বলে; ছোটখুড়ীমাকে গালাগালি দেয়!

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি হরি; যাও, ডেকে কথা কও গে।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, ওর কথা বলবার ভাবনা নেই মা! পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে সেইখানে যাক, ঢের বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে।

নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তোর মুখও ত নেহাত কম নয় হরি; তুই এমন কথা আমাদের বলিস! আচ্ছা, সেই ভাল! আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে যাব। ওঠো দিদি, জিনিসপত্রগুলো চাকরটা বেঁধেছেঁদে নিক্।

হরিচরণ মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, অতুল সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কান মলবে, নাকখত দেবে, তবে আমরা কথা ক'ব। তা নইলে ছোটখুড়ীমা—না, মা, সে আমরা কেউ পারব না। বলিয়াই আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজবৌ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ছোটবৌ একবার যদি ছেলেদের ডেকে বলে দেয়, তা হলে সমস্ত মিটে যায়!

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা যায়।

মেজবৌ কহিল, তবেই দেখ দিদি। এইসব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মানবে, না-ভালবাসবে? বলা যায় না ভবিষ্যতে কথা—নিজের ছেলেমেয়েরা তোমার পর হয়ে যাচ্চে, কিন্তু আমার অতুল-টতুলকে তোমরা যে যাই বল, তাদের মা-অন্ত প্রাণ। আমি বললে, সাধ্য কি তার এমন করে ঘাড় নেড়ে তেজ করে বেরিয়ে যায়! এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী এত কথায় বোধ করি মন দিতে পারেন নাই; নিরীহভাবে জবাব দিলেন, তা বটে। এ বাড়ির মণি থেকে পটল পর্যন্ত সবাই শৈলর বশে। সে যা বলবে যা করবে, তাই হবে—কেউ আমাকে মানেও না।

এটা কি ভাল?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কোন্টা? —ওরে ও নীলা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে দে ত মা।

নীলা কি কাজে এইদিকে আসিতেছিল, ফিরিয়া গেল। নয়নতারা আর কথা কহিল না, সিদ্ধেশ্বরীও উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

শৈলজা ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, জিনিসপত্র বাঁধা হয়েছে—এরা তবে চলে যাক?

শৈল কিছুই জানিত না, একটু ভীত হইয়া কহিল, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বৈ কি—কি পাষাণ প্রাণ তোর শৈল! তোর হুকুমে কেউ অতুলের সঙ্গে খেলা করে না, কথাবার্তা পর্যন্ত কয় না—কি করে বাছার দিন কাটে, শুনি? আর নিজের ছেলের দিবারাত্রি শুকনো মুখ দেখে বাপ-মাই বা কেমন করে এখানে বাস করে? তুই এদের তা হলে এ বাড়িতে রাখতে চাসনে বল্?

নয়নতারা চিমটি কাটিয়া কহিল, তা হলে হয়ত সবদিকেই ছোটবৌর হয় ভাল।

শৈলজা এ কথা কানে তুলিল না। সিদ্ধেশ্বরীকে কহিল, অমন ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ির কোনও ছেলেকেই মিশতে দিতে পারিনে দিদি। ও যে কি মন্দ হয়ে গেছে, তা মুখে বলা যায় না।

নয়নতারা আর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত মাথা গর্জিয়া উঠিল—হতভাগী, মায়ের মুখের সামনে তুই অমন করে ছেলের নিন্দে করিস! দূর হ আমার ঘর থেকে। মুখ যেন তোর খসে যায়।

আমি ইচ্ছে করে কখন তোমার ঘর মাড়াই নে মেজদি। কিন্তু তুমি এমনি করেই ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ। বলিয়া শৈল শান্তভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ পর্যন্ত বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুতেই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ কর দিদি, আমরা সরে যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি এমন করে আমাদের টেনে বেড়াচ্চ; কিন্তু ছোটবৌর এতটুকু ইচ্ছে নয়—আমরা এ বাড়িতে থাকি।

সিদ্ধেশ্বরী এ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, ওরা যা বলচে, অতুল কেন তাই করুক না। সেও ত ভাল কাজ করেনি মেজবৌ!

আমি কি বলচি—সে ভাল কাজ করেচে দিদি? জ্ঞানবুদ্ধি থাকলে কেউ কি বড়ভাইকে গালাগালি দেয়! আচ্ছা, আমি তার হয়ে তোমাদের সকলের পায় নাকখত দিচ্ছি, বলিয়া নয়নতারা মাটিতে সজোরে নাক ঘষিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাকে তোমরা মাপ করো দিদি, তার মুখ দেখে বুক আমর ফেটে যাচ্ছে—বলিয়া নয়নতারা আর একবার বোধ করি মাটিতে নাক ঘষিতে যাইতেছিল—সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিজেও চোখ মুছিলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনেক বলিয়া কহিয়া, অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াও শৈলকে রাজী করাইতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর মনের কথা খুলেই বল্ না শৈল, মেজবৌরা চলে যাক।

প্রত্যুত্তরে শৈল মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র। সে চাহনি সিদ্ধেশ্বরীকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করিয়া দিল; বলিলেন, আপনার মার পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি, আর লোকে আমাদের মুখ চুনকালি দিক। আমার সংসারে বনিয়ে না চলতে পার, যেখানে সুবিধে হয়, সেইখানে তোমরা চলে যাও—আমি আর পারিনে। ওদের চেয়ে তোমরা বাপু আমার বেশী আপনার নও। বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ করি, তাহার মনে মনে আশা ছিল, এইবার শৈলজা নরম হইয়া আসিবে। কিন্তু সে যখন একটা কথারও জবাব না দিয়া নিঃশব্দে নিজের মনে হাতা-বেড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া রান্না করিতেই লাগিল, তখন তিনি যথার্থই মহাক্রোধভরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা বড়কর্তা আহারে বসিলে, সিদ্ধেশ্বরী পাখার বাতাস করিতে করিতে দুঃখে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া সেই কথাই তুলিলেন; মেজবৌদের আর ত এ বাড়িতে থাকা পোষায় না দেখছি। আজ সকাল থেকেই তাদের জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হচ্ছে।

গিরীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বৈ কি! এমনি ত ছোটবৌয়ের সঙ্গে এক তিলার্ধ বনে না, তার ওপর ছোটবৌ বাড়িতে সব ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে—কেউ অতুলের সঙ্গে কথা কয় না। সে বেচারা এই ক'দিনে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেছে—

এইসময়ে শৈলজা দুধের বাটি-হাতে দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড়-চোপড় আর একবার ভাল করিয়া সামলাইয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পাতের কাছে বাটি রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, এই যে ছোটবৌ—বলিয়াই লক্ষ্য করিলেন, শৈল নিজের নাম শুনিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

ও-পক্ষের দোষ যতই হোক, অতুল ও তাহার জননীর দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে একটা মিটমাট হইলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু শৈল কিছুতেই বাগ মানিতেছে না দেখিয়া তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাই আজ তাহাকে শাস্তি দিতেই তিনি কোমর বাঁধিয়াছিলেন; বলিলেন, এই যে শৈল এখন থেকেই ভায়ে ভায়ে অসদ্ভাব করে দিচ্চে, বড় হলে এরা ত লাঠালাঠি মারামারি করে বেড়াবে—এটা কি ভাল?

কর্তা ভাতের গ্রাস মুখে পুরিয়া বলিলেন, বড় খারাপ।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলে লাগিলেন, ওর জন্যেই ত মণি অতুলকে অমন করে ঠ্যাঙ্গালে। আচ্ছা সে-ও মেরেচে, ও-ও গাল দিয়েচে—চুকেবুকে গেল, আবার কেন! আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে নিষেধ করে দেওয়া? আজ তুমি মণি হরিকে ডেকে বলে দিয়ো—তারা যেন অতুলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, নইলে ওরা চলে গেলে

যা পাড়ার লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দেবে। সত্যিই ত আর ছোটবৌয়ের জন্যে মায়ের পেটের ভাই-ভাজকে তুমি ছাড়তে পারবে না!

তা ত নয়ই, বলিয়া তিনি আহার করিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, ছোটঠাকুরপো কি কোনদিন কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করবে না? এমনি করেই কি চিরটা কাল কাটাবে?

স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থিত হইবামাত্রই শৈলজা কানে হাত দিয়া দ্রুতপদে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কর্তা কি জবাব দিলেন, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। কান পাতিয়া এইসকল প্রসঙ্গ সে কোনদিন শুনিত না এবং শুনিতে ইচ্ছাও করিত না।



পাঁচ

সিদ্ধেশ্বরী যত বড় ক্রোধের উপরেই স্বামীর কাছে নালিশ করিতে শুরু করুন, শৈলকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁর চৈতন্য হইল—কাজটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া গেল! স্বামী লইয়া খোঁটা দিলে শৈলর দুঃখ এবং অভিমানের অবধি থাকিত না তাহা তিনি জানিতেন।

স্ত্রীকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া কর্তা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; এবং কহিলেন, আমি বেশ করে ধমকে দেব'খন। বলিয়া আহার সমাধা করিয়া পান চর্বণ করিবার সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বস্তুত গিরীশের স্বভাবটা অদ্ভুত রকমের ছিল। আদালত মকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কি খরচ হইতেছে, ছেলেরা কি করিতেছে, কিছুই তিনি খবর লইতেন না। টাকা রোজগার করিতেন এবং ভালোমন্দ সব কথাতেই সায় দিয়া, যা হোক একটা মতামত প্রকাশ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতেন।

সুতরাং 'ধমকে দেব'খন' বলিয়া কর্তার কর্তব্য শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী কথাও কহিলেন না; কাহাকে ধমকাইবেন—কেন ধমকাইবেন—জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

নয়নতারা পাশের ঘরে আড়ি পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল, ভাশুর এবং বড়জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিত-চিত্তে প্রস্থান করিল। কিন্তু মিনিট-কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অমন করে বসে কেন দিদি, বেলা হ'ল, যা হোক চাট্টি মুখে দেবে চল।

সিদ্ধেশ্বরী উদাসভাবে বলিলেন, বেলা আর কোথায়—এই ত সবে এগারোটা।

এগারোটা কি সোজা বেলা দিদি? তোমার এই অসুখ শরীরে যে বেলা ন'টার মধ্যেই খাওয়া দরকার।

সিদ্ধেশ্বরীর এখন খাওয়া—দাওয়ার কথাবার্তা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বলিলেন, তা হোক মেজবৌ, আমি কোনদিনই এত শিগ্‌গির খাইনে—আমার একটু দেরি আছে।

নয়নতারা ছাড়িল না, কাছে আসিয়া হাত ধরিল। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঢালিয়া দিয়া কহিল, এইজন্যেই ত পিত্তি পড়ে দেহের এই আকার! আমার হাতে হেঁশেল থাকলে আমি ন'টা পেরুতে দিই? তুমি না বাঁচলে কার আর কি দিদি, আমাদেরই সর্বনাশ। নাও চল, যা হোক দুটো তোমাকে খাইয়ে দিয়ে একটু সুস্থির হই।

নয়নতারা হাত ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে রান্নাঘরে লইয়া গেল এবং নিজের হাতে ঠাঁই করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া, বামুনঠাকরুনের দ্বারা ভাত বাড়াইয়া আপনি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নিরামিষ দিকের রান্না শৈলজা রাঁধিত। মেজবৌ নীলাকে ডাকিয়া কহিল, তোর ছোটখুড়ীকে বল্ গে ও-হেঁশেলে কি আছে এনে দিতে।

মিনিট-খানেক পরে শৈল আসিয়া তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীর পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছিল—তিনি মেজজাকে লক্ষ্য করিয়া রোগর কণ্ঠে চিঁচিঁ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা এইসঙ্গে কেন বসলে না মেজবৌ।

মেজবৌ কহিল, আমরা ত আর তোমার মত মরতে বসিনি দিদি। তুমি খেয়ে ওঠো, আমি তোমার পাতেই বসব। শৈলজার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল, না দিদি, আমি বেঁচে থাকতে কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমাকে পালাতে দেব না, তা বলে দিচ্চি। একটুখানি চুপ করিয়া, ছোটবৌ কত দূরে আছে দেখিয়া লইয়া কহিল, এরা দু'জনে যেমন সহোদর, আমরাও ত তেমনি দুটি বোন। যেখানে যতদূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যত নাড়ীর টানে তোমার জন্যে কেঁদে মরব, আর কি কেউ তেমন করে কাঁদবে ? অপরে করবে নিজের ভালোর জন্যে, কিন্তু আমি করব ভেতর থেকে। দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ সত্যিকারের আপনার জন নেই—এই কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেও না।

সিদ্ধেশ্বরী বিগলিত-কণ্ঠে কহিলেন, এ কি ভোলবার কথা মেজবৌ ? এতদিন যে তোমাকে চিনতে পারিনি তার শাস্তিই ত ভগবান আমাকে দিচ্চেন।

মেজবৌ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া কহিল, শাস্তি যা-কিছু ভগবান যেন আমাকেই দেন, দিদি। সমস্ত দোষ আমার, আমিই তোমাকে চিনিনি। একটুখানি থামিয়া পুনরায় কহিল, আজ যদি বা জানতে পেলুম, আমরা তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্য নই, কিন্তু জানবো সে কথা কি করে দিদি ? তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করব, ভগবান সে দিন ত আমাকে দিলেন না। আমরা হয়েচি যে ছোটবোর দু'চক্ষের বিষ !

সিদ্ধেশ্বরী উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা হলে সে যেন তার ছেলেপিলে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকে। আমি তার সাতগুষ্টিকে দুধেভাতে খাওয়াব কি নিজের সর্বনাশ করবার জন্যে। খুড়তুত ভাই, ভাজ, তাদের ছেলেপুলে—এই সম্পর্ক। ঢের খইয়েচি, ঢের পরিয়েচি—আর না ; দাসী-চাকরের মত মুখ বুজে আমার সংসারে থাকতে পারে থাক, না হয় চলে যাক।

অদূরে চৌকাঠ ধরিয়া শৈল দাঁড়াইয়াছিল, সিদ্ধেশ্বরী তাহা স্বপ্নেও মনে করেন নাই। হঠাৎ তাহার আঁচলের চওড়া লাল পাড়টা প্রদীপ্ত অগ্নিরেখার মত সিদ্ধেশ্বরীর চোখের উপর জ্বলিয়া উঠিতেই, তিনি গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ঠিক পাশের কবাটের চৌকাঠ ধরিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এতক্ষণের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছে। চক্ষের পলকে ভয়ে তাঁহার আহারের রুচি চলিয়া গেল ; এবং সেই মেজবৌকে তাহার সমস্ত আত্মীয়তার সহিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তিনি আর কোথাও ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই যেন এ যাত্রা রক্ষা পান—তাঁহার এমনি মন হইল।

মেজবৌ মহা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, ও কি দিদি, শুধু হাত নাড়চ—খাচ্চ না যে ?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিলেন, না।

মেজবৌ কহিল, আমার মাথা খাও দিদি, আর দুটি খাও—

তাহার কথাটা শেষ না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন মিছে কতকগুলো বকচ মেজবৌ, আমি খাব না—যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে, বলিয়া সহসা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন।

নয়নতারা হাঁ করিয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কিন্তু বিহ্বল হইয়া নিজের ক্ষতি করিবার লোক সে নয়। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া গিয়া যেখানে মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া সে তাঁহার হাত ধরিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, না জেনে অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি দিদি, আমি মাপ চাইচি। তুমি রোগা শরীরে উপোস করে থাকলে, আমি সত্যি বলচি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সিদ্ধেশ্বরী নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া গিয়া যা পারিলেন নীরবে আহার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ এত ব্যথা তিনি শৈলকে দিলেন কি করিয়া ? এবং ইহার অনিবার্য শাস্তিস্বরূপ সে যে এইবার তাহার সেই অতি কঠোর উপবাস শুরু করিয়া দিবে ইহাতেও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং দুপুরবেলা নীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন, খুড়ীমা ভাত খইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদ কতটুকু হইল বলা যায় না, কিন্তু বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। শৈল তাহার চিরদিনের স্বভাব অতিক্রম করিয়া কি করিয়া যে অকস্মাৎ এমন শান্ত এবং ক্ষমাশীল হইয়া উঠিল তাহা কোনমতেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

গিরীশ এবং হরিশ দুই ভাই আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় একত্রে জল খাইতে বসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী অদূরে ম্লানমুখে বসিয়াছিলেন—আজ তাঁহার দেহ-মন কিছুই ভালো ছিল না।

গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়াই গিরীশের সকালের কথা স্মরণ হইল। সব কথা মনে না হোক, রমেশকে বকিতে হইবে—তাহা মনে পড়িল। দ্বারের কাছে নীলা দাঁড়াইয়া ছিল—তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, তোর ছোটকাকাকে ডেকে আন নীলা।

সিদ্ধেশ্বরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, তাকে আবার কেন?

কেন? তাকে রীতিমত ধমকে দেওগা দরকার। বসে বসে সে যে একেবারে জানোয়ার হয়ে গেল।

হরিশ ইংরাজী করিয়া বলিলেন, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, না—না, বৌঠান, তুমি তাকে প্রশ্রয় দিয়ো না—সে ছেলেমানুষটি নয়।

সিদ্ধেশ্বরীর জবাব দিলেন না, রুষ্ট মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রমেশ তখন বাটীতেই ছিল—দাদার আহ্বানে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। গিরীশ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, অতুলের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেচিস কেন?

রমেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, ঝগড়া করেচি?

গিরীশ ক্রুদ্ধকনেঠ কহিলেন, আলবত করেচিস। বলিয়া গৃহিনীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, বড়গিন্নী বলছিলেন, তুই যা মুখে আসে, তাই বলে তাকে গালমন্দ করেচিস। ও কি আমাকে মিথ্যা কথা বললে?

রমেশ অবাক হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী গর্জিয়া উঠিলেন, তোমার কি ভীমরতি ধরেচে? কখন তোমাকে বললুম ছোটঠাকুরপো অতুলকে গালমন্দ করেছে?

হরিশ ভ্রম সংশোধন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না—না, সে ছোটবৌমা।

তখন গিরীশ বলিলেন, ছোটবৌমাই বা কেন গালমন্দ করবেন শুনি?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি সক্রোধে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, সেই বা কেন অতুলকে গালমন্দ করবে! সেও করেনি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বলব আমি। তুমি ছোটঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্চ কেন?

গিরীশ কহিলেন, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে, খড়ের দালালি করে আমার চার-চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি, আর দেখ গে যা বাগবাজারের খাঁ-দের। এই খড়ের দালালিতে ক্রোড়পতি হয়ে গেল।

হরিশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, খড়ের দালালি?

রমেশ কহিল, আজ্ঞে না, পাটের।

গিরীশ রাগিয়া বলিলেন, তারা আমার মক্কেল-অমি জানিনে, তুই জানিস! খড়ের দালালি করেই তারা বড়লোক। বিলাতে জাহাজ-জাহাজ খড় পাঠাচ্ছে।

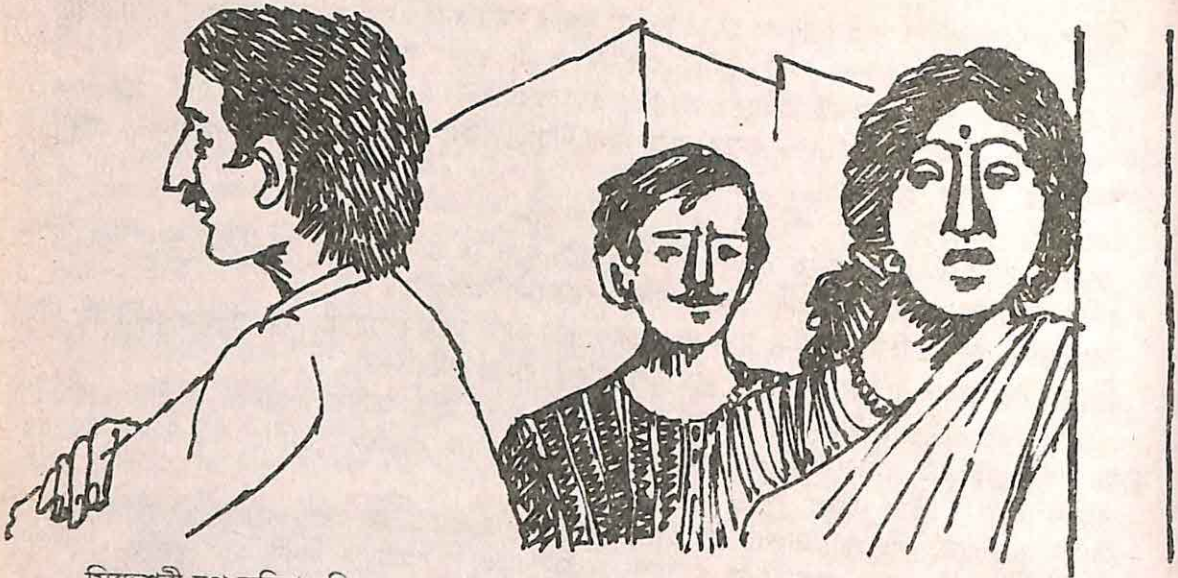
হরিশ এবং রমেশ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল।

গিরীশ তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় পাটই হ'লো। এই পাটের দালালি করে তুই কি দু'শ এক'শও করে আনতে পারিস নে? তোমাদের আমি ত চিরকালটা বসে বসে খাওয়াতে পারব না! 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।' একবার চার হাজার গেছে—গেছেই। কুছ পরোয়া নেই—আর চার হাজার দাও। না হয়, আরো চার হাজার দাও। তা বলে, আমি খেটে মরব, আর তুমি বসে বসে খাবে?

হরিশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, সব কাজ ফিখতে হয়; নইলে, পাটের দালালি ত করলেই হয় না! বার বার এই টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয়।

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, নয়ই ত। আমি পাটের দালালি-টালালি বুঝিনে, তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে শুরু করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেব। চার হাজার টাকার খড় কিনবে, চার হাজার টাকা জমা থাকবে। এটা নষ্ট হলে তবে ও-টাকায় হাত দেবে—তার আগে নয়। বুঝলে? আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়াতে পারব না—যাও।

রমেশ নীরবে চলিয়া গেল হরিশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এই আট হাজার টাকাই জলে গেল ধরে রাখুন। কি বল বৌঠান?



সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব না পাইয়া হরিশ দাদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবেন নাকি?

গিরীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সত্যি কি রকম?

হরিশ বলিলেন, এই সেদিন চার হাজার টাকা জলে দিলে, আবার আট হাজার সেই জলেই ফেলতে দেবেন, এ যেন আমি ভাবতেই পারিনে।

গিরীশ কহিলেন, তা হলে তুমি কি রকম করতে বল?

হরিশ বলিলেন, রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কি দাদা? আট হাজার দিন, আর আট লাখই দিন, আটটা পয়সাও ফিরিয়ে আনতে পারবে না—আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এই টাকাটা উপার্জন করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি!

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, ঠিক ঠিক, ঠিক বলেচ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা, ঠিক ত। ও কি আবার একটা মানুষ?

হরিশ উৎসাহ পাইয়া বলিতে লাগিলেন, তার চেয়ে বরং একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে করুক। যার যেমন ক্ষমতা তার তেমনই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়াবার জন্যে আমাকে মাসে ২৫ টাকা মাস্টারকে দিতে হচ্চে, এ কাজটাও ত ওর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়েও আমাদের কতক সাহায্য করতে পারে।

কি বল বৌঠান?

কিন্তু বৌঠান জবাব দিবার পূর্বেই গিরীশ খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক, ঠিক কথা বলেচে হরিশ। কাঠবিড়াল নিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধেছিলেন যে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, দেখেচ বড়বৌ, হরিশ ঠিক ধরেছে। আমি বরাবর দেখেচি কিনা ছেলেবেলা থেকেই ওর বিষয়-বুদ্ধিটা ভারী প্রখর। ভবিষ্যৎ ও ভেবে দেখতে পারে এমন কেউ নয়। আমি ত আর একটু হলেই এতগুলো নষ্ট করে ফেলেছিলাম। কাল থেকেই রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে দিক। খবরের কাগজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

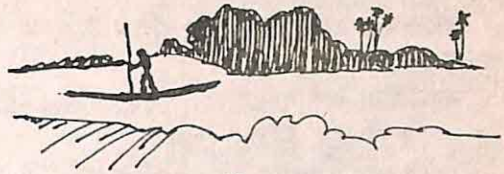
সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, টাকাটা কি তবে দেবে না নাকি?

নিশ্চয় না। তুমি বল কি, আবার নাকি আমি টাকা দিই তাকে?

তবে এমন কথা বলাই বা কেন?

হরিশ কহিলেন, বললেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নাই বৌঠান। আমিও ত দাদার সহোদর, আমারও ত একটা মতামত নেওয়া চাই। সংসারে টাকা নষ্ট হলে আমরও ত গায়ে লাগে।

সেইটেই তোমার আসল কথা ঠাকুরপো, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।



ছয়

সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার নয়নতারা গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেবা এমনি নিরেট, এমনি ভরাট যে, তাহার কোন এতটুকু ফাঁক দিয়া আর কাহারও কাছে ঘেঁষিবার জো ছিল না। সিদ্ধেশ্বরী এমন সেবা তাঁর এতখানি বয়সে কখনও কাহারও কাছে পান নাই। তবুও কেন যে তাঁহার অশান্ত মন অনুক্ষণ শুধু ছল ধরিয়া কলহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল এ রহস্য জানিত শুধু অন্তর্যামী। সেদিন সকালে সিদ্ধেশ্বরী ছয়মাসের রোগীর মত টলিয়া টলিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত-দুর্বল কণ্ঠে, বোধ করি বা সুমুখের দেয়ালটাকেই উপলক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার জন বটে মেজবৌ, সে না থাকলে আমাকে দেখচি বেঘোরে মরতে হয়। এমনি সেবাযত্ন অমার মায়ের পেটের বোন থাকলে করতে পারত না।

শৈল ঘরের ভিতর রাঁধিতেছিল, সমস্তই শুনিতে পাইল। এই কয়টা দিন সে বড়জায়ের ঘরেও যায় নাই, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহে নাই। এখনও চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুনরায় শুরু করিলেন, আর অপরকে খাওয়ানো-পরানো শুধু অধর্মের ভোগ—ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। আর এই আমার মেজবৌ। মুখের কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ-হাঁ করে এসে পড়ে। আমি হেঁটে গেলে তার বুকে বাজে। আমার পোড়া কপাল যে, এমন মানুষকে আমি পরের ভাঙ্চি শুনে পর মনে করেছিলুম।

শৈলর চুড়ির শব্দ, হাতা-বেড়ি নাড়ার শব্দ সবই তাঁহার কানে আসিতেছে। এত কাছে থাকিয়াও সে যখন এত বড় মিথ্যা অভিযোগের কোন জবাব দিল না, তখন আর তাঁহার অধৈর্যের সীমা রহিল না। তাঁর চিঁচিঁ কণ্ঠস্বর একমুহূর্তেই প্রবল ও সতেজ হইয়া উঠিল ; মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেচে তা যে কারুকে দিয়ে একটুখানি পড়িয়ে শুনব, আমার সে জোটি পর্যন্ত নেই। পরকে খাওয়ান-পরান আমার কিসের জন্যে ?

নীলা ছোটখুড়ীর কাছে বসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল ; সেইখান হইতে কহিল, সে চিঠি যে মেজখুড়ীমা তোমাকে দু-তিনবার পড়ে শোনালেন মা! আবার কবে নতুন চিঠি এল ?

তুই সব কথায় গিন্নীপনা করতে যাসনে নীলা, বলিয়া মেয়েকে একটা ধমক দিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, চিঠি শুনলেই হ'লো। তার জবাব দিতে হবে না ? কেন তোর ছোটখুড়ী কি মরেছে যে আমি ও-পাড়ার লোক ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাব ?

নীলাও রাগ করিয়া বলিল, চিঠি লেখবার কি আর কেউ নেই মা, যে আজ সংক্রান্তির দিনটায় তুমি খুড়ীমাকে মরিয়ে দিচ্চ ?

আজ সংক্রান্তি, সে কথাটা সিদ্ধেশ্বরীর স্মরণ ছিল না। তিনি একমুহূর্তেই একেবারে পাংশু হইয়া বলিলেন, তুই যে অবাক করলি নীলা ? বালাই ষাট ! মরবার কথা আমি তাকে কখন বললুম লা ? পেটের মেয়ে আমাকে মুখনাড়া দেয় ! কাল যার বিয়ে দিয়ে এনে কোলেপিঠে মানুষ করলুম, সে আমার ছায়া মাড়ায় না ; এত যে রোগে ভুগচি, তবুও ত আমার মরণ হয় না ! আজ থেকে আর যদি একফোঁটা ওষুধ খাই ত আমার অতি বড়—

কান্নায় সিদ্ধেশরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে গিয়া একেবারে মড়ার মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা পাশের বারান্দায় জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল ; এখন ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পায়ের কছে গিয়া বসিল। আস্তে আস্তে বলিল, একখানা চিঠির জবাব দেবার জন্য আবার তার খোশামোদ করতে যাওয়া কেন দিদি ? আমাকে হুকুম করলে ত দশখানা জবাব লিখে দিতে পারতুম।

সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না ; পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

নয়নতারা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে এখনি কে সেটা লিখে দিতে হবে দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বড় বকাও মেজবৌ। বলচি, সে এখন থাক—সে তুমি পারবে না। তা না—

নয়নতারা রাগ করিল না। যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়, সেখানে তার ক্রোধ-অভিমান প্রকাশ পাইত না। সে নীরবে উঠিয়া গেল।

বেলা দুটা-আড়াইটার সময় সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর খুড়ীমা ভাত খেয়েছে রে?

নীলা আশ্চর্য হইয়া বলিল, খাবেন না কেন? রোজ যেমন খান, তেমনিই ত খেয়েছেন।

সিদ্ধেশ্বরী হুঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, শৈল চিরকালই অত্যন্ত অভিমানী। সামান্য কারণেই সে খাওয়া বন্ধ করিত এবং তাই লইয়া সিদ্ধেশ্বরীর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। হাতে ধরিয়া খোশামোদ করিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া নানা প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইত। অথচ, সেই শৈল এবার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এত গঞ্জনাতেও কেন যে বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, ইহার কোন কারণই তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার এই ব্যবহার তাঁহার কাছে যতই অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক ঠেকিতে লাগিল, ততই তিনি অন্তরের মধ্যে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোনমতে একটা প্রকাশ্য কলহ হইয়া গেলেই তিনি বাঁচেন—কিন্তু তাহার ধার দিয়াও শৈল যায় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত সে তাহার নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যায়। তাহার আচরণে বাড়ির কেহ কিছুই দেখিতে পায় না ; শুধু যিনি দশ বছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই কেবল ভয়ার্তচিত্তে অনুক্ষণ অনুভব করেন শৈলর চারিপাশে একটা নির্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিনই পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে শুধু ঝাপসা দুর্নিরীক্ষ্য করিয়াই আনিতেছে।

নীলা কহিল, মা, আমি যাই?

মা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় শুনি?

নীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী তখন ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া, চেঁচাইয়া কহিলেন, কোথায় যেতে হবে শুনি? ছোটখুড়ীর সঙ্গে তোর এত কি লা যে একদণ্ড আমার কাছে বসতে পারিস না? বসে থাক পোড়ারমুখী চুপ করে এইখানে। কোথাও তোকে যেতে হবে না। বলিয়া নিজেই ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন।

নয়নতারা মৃদু-পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া সস্নেহে অনুযোগের স্বরে কহিল, ছি মা, বড় হয়েচ, দু'দিন পরে শ্বশুরঘর করতে চলে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও বাপ-মায়ের সেবা করে নাও। মায়ের কাছে বসবে, দাঁড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুটো ভালো কথা শিখে নেবে ; এ সময়ে কি যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত? যাও, কাছে বসে দু'দণ্ড পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, দিদি ঘুমিয়ে পড়ুন। রোগা শরীরে অনেকক্ষণ জেগে আছেন।

নীলা মেজখুড়ীর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। মুখ তুলিয়া উত্তপ্তকণ্ঠে কহিল, বাড়ির মধ্যে যার-তার সঙ্গে আর কার সঙ্গে সারাদিন কাটাই মেজখুড়ীমা? তুমি কি খুড়ীমার কথা বলচ?

তাহার রুষ্ট আরক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া নয়নতারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, আমি কারো কথা বলিনি নীলা, আমি শুধু বলচি, তোমার রোগা মায়ের সেবাযত্ন করা উচিত।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, সেবাযত্ন করবে! আমি ম'লেই বরঞ্চ ওরা বাঁচে।

নয়নতারা কহিল, ভাল, ওই না হয় ছেলেমানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি নেই, কিন্তু ছোটবৌ ত ছেলেমানুষ নয়! তার ত বলা উচিত, যা নীলা, দু মিনিট গিয়ে তোর মায়ের কাছে বোস। না সে নিজে আসবে, না মেয়েটাকে আসতে দেবে।

নীলা কি একটা জবাব দিতে গিয়া চাপিয়া গিয়া মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তোমাকে সত্যি বলচি মেজবৌ, আমার এমন ইচ্ছা করে না যে শৈলর আর মুখ দেখি। আমার যেন সে দুটি চক্ষের বিষ হয়ে গেছে।

নয়নতারা কহিল, অমন কথা বলো না দিদি। হাজার হোক সে সকলের ছোট। তুমি রাগ করলে তাদের আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এ কথাটা ত মনে রাখতে হবে। ভাল কথা। এ মাসে উনি পাঁচ শ টাকা

পেয়েছিলেন, তার খুচরো ক'টাকা নিজের হাতে রেখে বাকী টাকা তোমাকে দিতে দিলেন ; এই নাও দিদি—বলিয়া নয়নতারা আঁচলে গ্রন্থি খুলিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল।

উদাস-মুখে সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়ইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, নীল, যা তোর ছোটখুড়ীমাকে ডেকে আন, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখুক।

নয়নতারার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা উপলক্ষ করিয়া সে কল্পনায় যে-সকল উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আগাগোড়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু যে সিদ্ধেশ্বরীর মুখে আনন্দের রেখাটি মাত্র ফুটিল না, তাহা নয় ; এই টাকাটা তুলিবার জন্য অবশেষে এই ছোটবৌকেই কিনা ডাক পড়িল—সিন্দুকের চাবি এখনও তাহারই হাতে ! বস্তুতঃ, এই টাকাটা দেওয়া সম্বন্ধে একটুখানি গোপন ইতিহাস ছিল। হরিশের দিবার ইচ্ছাই ছিল না, শুধু নয়নতারা মস্ত একটা জটিল সাংসারিক চাল চালিবার জন্যই স্বামীকে নিরন্তর খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ইহা বাহির করিয়া আনিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর এই নিস্পৃহ আচরণে এতগুলো টাকা ত জলে গেলই, উপরন্তু রোষে ক্ষোভে তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল।

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। ছয়দিন পর সে বড়জায়ের মুখের পানে চাহিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি কি আমাকে ডাকছিলে ?

শৈলর মুখের মাত্র এই দুটি কথার প্রশ্নই সিদ্ধেশ্বরীর কানের মধ্যে অজস্র মধু ঢালিয়া দিল। তিনি চক্ষের পলকে বিগলিতচিত্তে শশব্যস্ত উঠিয়া বলিলেন, হাঁ দিদি, ডাকছিলুম বৈ কি ! অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নীলাকে বললুম, যা মা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে আন, টাকাগুলো তুলে ফেলুক। এই নাও—বলিয়া তিনি শৈলর প্রসারিত ডান হাতের উপর নোট কয়খানি ধরিয়া দিলেন।

শৈল আঁচলে-বাঁধা চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া ধীরে-সুস্থে টাকা তুলিতে লাগিল, চাহিয়া চাহিয়া নয়নতারার অসহ্য হইয়া উঠিল। তথাপি ভিতরের চাঞ্চল্য কোনমতে দমন করিয়া, একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, তাই তোমার দেওর কাল আমাকে বললেন, দিদি, 'জাততুত-খুড়তুত ভাই নয়, মায়ের পেটের বড় ভাই। তাঁর খাব না, পরব না ত আর যাব কোথায় ? তবু, মাসে মাসে এমনি পাঁচশ-ছ'শ টাকা করেও যদি দাদাকে সাহায্য করতে পারি ত অনেক উপকার !' কি বল দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরীর হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বোধ করি তাঁহার গাম্ভীর্যের হেতু অনুমান করিতে পারিল না। কহিল, শ্রীরামচন্দ্র কাঠবিড়াল নিয়ে সাগর বেঁধেছিলেন। তাই তিনি যখন-তখন বলেন, বড়বোঠান মুখ ফুটে যেন কারো কাছে কিছু চান না ; কিন্তু তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাকবে না ? যার যেমন শক্তি, কাজ ক'রে তাঁকে সাহায্য করা ত চাই। নইলে বসে বসে শুধু গুষ্টিবর্গ মিলে খাবো, বেড়াবো আর ঘুমাবো, তা করলে কি চলে ? তোমারও ত হরি-মণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই ! আমাদের জন্যে সর্বস্ব উড়িয়ে দিলে ত তোমার চলবে না ! ঠিক কিনা, সত্যি বল দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, তা সত্যি বৈ কি !

শৈল সিন্দুক বন্ধ করিয়া সুমুখে আসিয়া সেই চাবিটা তাহার রিং হইতে খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তীক্ষ্ণ-ধীরভাবে কহিলেন, এটা কি হ'লো ছোটবৌ ?

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ক'দিন ধরেই ভেবে দেখছিলুম দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে—মতিভ্রম হতে কতক্ষণ, কি বল মেজদি ?

নয়নতারা কহিল, আমি ত তোমার কোন কথাতেই নেই ছোটবৌ, আমাকে মিছে কেন জড়াও ?

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন, শুনতে পাই কি ?

শৈল কহিল, একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, তার মানে নেই। এমনি ত তোমাদের শুধু আমরা খাচ্চি, পরচি। না পারি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে, না পারি গতর দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু তাই বলে কি চিরকাল করা ভালো ?

15104

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধ রোষে মুখ রাঙ্গা করিয়া কহিলেন, এত ভাল কবে থেকে হলি লা ? এত ভালমন্দর বিচার এতদিন তোদের ছিল কোথায় ?

শৈল অবিচলিত-স্বরে বলিল, কেন রাগ করে শরীর খারাপ করচ দিদি ? তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগচে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগচে না।

ক্রোধে সিদ্ধেশ্বরীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

নয়নতারা তাঁহার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদির না হয় ভাল না লাগতে পারে, সে কথা মানি, কিন্তু তোমার লাগচে না কেন ছোটবৌ ?

শৈল ইহার জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, বলে যা পোড়ারমুখী, কবে তুই বিদায় হবি—আমি হরির নোট দেব ! আমার সোনার সংসার ঝগড়া-বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিলি। মেজবৌ কি মিছে বলে যে, কোমরের জোর না থাকলে মানুষের এত তেজ হয় না ? কত টাকা আমার তুই চুরি করেচিস, তার হিসেব দিয়ে যা।

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখ অগ্নিকান্ডের মত মুহূর্তকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছিন্ন-শাখার ন্যায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবৌ ; সে আমাকে এমনি করে অপমান করে গেল ! কর্তারা বাড়ি আসুন, ওকে আমি উঠানের মাঝখানে যদি না আজ জ্যান্ত পুঁতি ত আমার নাম সিদ্ধেশ্বরী নয়।



সাত

সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল—তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। আজিকার দৃঢ়নির্ভরতা কাল সামান্য কারণেই হয়ত শিথিল হইতে পারিত। শৈলকে তিনি চিরদিন একান্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু, দিন-কয়েকের মধ্যেই নয়নতারা যখন অন্যরূপ বুঝাইয়া দিল, তখন তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে, কথাটা ঠিক যে, শৈলর হাতে টাকা আছে, এই টাকার মূল যে কোথায় তাহাও অনুমান করা তাঁহার কঠিন হইল না। তথাপি সে যে স্বামী-পুত্র লইয়া এই শহর অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কোনমতেই থাকিতে সাহস করিবে না ইহাও তিনি জানিতেন।

রাত্রে বড়কর্তা তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া, গ্যাসের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে জরুরী মকদ্দমার দলিলপত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার কাজকর্ম করে লাভটা কি, আমাকে বলতে পার ? কেবল শুয়োরের পাল খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্রি খেটে মরবে ?

গিরীশের খাওয়ার কথাটাই বোধ করি শুধু কানে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, না, আর দেরি নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্ছি।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, খাওয়ার ক'থা তোমাকে কে বলেচে ! আমি বলচি, ছোটবৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন। এতদিন যে তাদের এত করলে, সব মিছে হয়ে গেল সে খবর শুনেচ কি ?

গিরীশ কতকটা সচেতন হইয়া বলিলেন, হুঁ শুনেচি বৈ কি। ছোটবৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল। সঙ্গে কে কে গেল—মণিকে—মকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এইভাবে থামিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন—আমার একটা কথাও কি তোমার কানে তুলতে নেই ? আমি কি বলচি, আর তুমি কি জবাব দিচ্চ ? ছোটবৌরা যে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে।

ধমক খাইয়া গিরীশ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চে ?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, কোথায় যাচ্ছে তার আমি কি জানি ?

গিরীশ কহিলেন, ঠিকানাটা লিখে নাও না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে, অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, পোড়া কপাল ! আমি নিতে যাব তাদের ঠিকানা লিখে ! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট না হবে ত তোমার হাতে পড়ব কেন ? বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন ? বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাপ-মা যে তাঁহাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পর সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। কহিলেন, আজ যদি তুমি দু'চক্ষু বোজো, আমি না হয় কারো বাড়ি দাসীবৃত্তি করে খাবো, সে আমাকে করতেই হবে তা বেশ জানি—আমার মণি-হরি যে কোথায় দাঁড়াবে, তার—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন এতক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া একেবারে দুই চক্ষু ভাসাইয়া দিল।

জরুরী মকদ্দমার দলিল -দস্তাবেজ গিরীশের মগজ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রীর আকস্মিক ও অত্যুগ্র ক্রন্দনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি ক্রুদ্ধ, গম্ভীরকণ্ঠে ডাক দিলেন—হরে ?

হরি পাশের ঘরে পড়িতেছিল। শশব্যস্ত ছুটিয়া আসিল।

গিরীশ প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিলেন, ফের যদি তুই ঝগড়া করবি ত ঘোড়ার চাবুক তোর পিঠে ভাঙ্গবো। হারামজাদার লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা আর ঝগড়া ! মণি কৈ ?

পিতার কছে বকুনি খাওয়াটা ছেলেরা জানিতই না। হরি হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, জানিনে।

জান না ? তোদের বজ্জাতি আমি টের পাইনে, বটে ? আমার সবদিকে চোখ আছে, তা জানিস ? কে তোদের পড়ায় ? ডাক্ তাকে ?

হরি অব্যক্তকণ্ঠে কহিল, আমাদের থার্ডমাস্টার ধীরেনবাবু সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ প্রশ্ন করিলেন, কেন সকালে ? রাত্রে পড়ায় না কেন শুনি ? আমি চাইনে এমন মাস্টার, কাল থেকে অন্য লোক পড়াবে। যা, মন দিয়ে পড় গে যা ; হারামজাদা বজ্জাত !

হরি শুষ্ক ম্লানমুখে মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

গিরীশ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দেখেচ আজকালকার মাস্টারগুলোর স্বভাব ? কেবল টাকা নেবে, আর ফাঁকি দেবে। রমেশকে বলে দিয়ো, কালই যেন এই ধীরেনবাবুকে জবাব দিয়ে অন্য মাস্টার রেখে দেয়। মনে করেচে, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে !

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর মুখের প্রতি শুধু একটা রোষকষায়িত তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন এবং গিরীশ কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সমাপন করিয়াছেন মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাজগপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

টাকা জিনিসটা সংসারে যে আবশ্যকীয় বস্তু, এ খবর সিদ্ধেশ্বরীর যে জানা ছিল না, তাহা নয়, কিন্তু সেদিকে এতদিন তাঁহার খেয়াল ছিল না। কিন্তু লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার ছোঁয়াচ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ-মনে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।

আজই খাওয়া-দাওয়া পর শৈল এ বাটী হইতে বিদায় লইবে, এইরূপ একটা জনশ্রুতিতে সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়া একটা সুদীর্ঘ ক্রন্দন বাহির হইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। তিনি সেইটা কোনমতে নিবারণ করিয়া জ্বরের ভান করিয়া বিছানাতেই পড়িয়া ছিলেন, নয়নতারা আসিয়া নিকটে বসিল। গায়ে হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার ডাকা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

সিদ্ধেশ্বরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, না।

নয়নতারা বিরক্তির কারণ অনুভব করিয়া ঠিক ওষুধ দিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাই আমি ভাবছিলুম দিদি, লোক কি করে হাতে এত টাকা করে। আমাদের পাড়ায় যদুবাবু, গোপালবাবু, হারাণ সরকার কেউ ত আমার বট্‌ঠাকুরের অর্ধেক রোজগার করে না, তবু তাদের কারও লাখ টাকার কম ব্যাঙ্কে জমা নেই। তাদের পরিবারের হাতেও দশ-বিশ হাজারের কম নেই।

সিদ্ধেশ্বরী ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, কি করে জানলে মেজবৌ ?

নয়নতারা কহিল, ইনি যে ব্যাঙ্কের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা সব এঁর বন্ধু কিনা। কাল গোপালবাবুর স্ত্রী আমার কথায় অবিশ্বাস করে বললে, এ কি একটা কথা মেজবৌ, যে তোমার দিদির হাতে টাকা নেই ? যেমন করে হোক—

সিদ্ধেশ্বরী জ্বর ভুলিয়া উঠিয়া বসিয়া নয়নতারার সম্মুখে চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বাক্স-পেটরা তুমি নিজের হাতে খুলে দেখ না মেজবৌ, সংসারখরচের টাকা ছাড়া কোথাও যদি নুকোনো একটা পয়সা দেখতে পাও। যা করবে ছোটবৌ। আমার কি একটা কথা বলাবার জো ছিল ! এমন সোয়ামীর হাতে পড়েছিলুম মেজবৌ, যে কখনো একটা পয়সার মুখ দেখতে পেলুম না। তেমনি শাস্তিও হয়েচে। এখন সে সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্চে—কি করবে তার ? কিন্তু আমার হাতে টাকা থাকলে সে টাকা ঘরেই থাকত, না এমনি করে জলে যেত তা বল দেখি মেজবৌ ?

মেজবৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, সে ত সত্যি কথা দিদি।

সিদ্ধেশ্বরীর মন শৈলর বিরুদ্ধে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে তিনি নিজেই শৈলকে মানুষ করিয়া নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া, আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, একটা লোক রোজগারী, আর এতবড় সংসার তাঁর মাথায়, তাঁরই বা দোষ দিই কি করে বল দেখি ?

নয়নতারা সায় দিয়া বলিল, সে ত সবাই দেখতে পাচ্ছি দিদি !

একটু চুপ করিয়া নয়নতারা মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, আমাদের গাঁয়ের নন্দ মিত্তির একজন ডাকসাইটে কেরানী। ছোটভাইকে মানুষ করতে, লেখাপড়া শেখাতে তার ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে নিজের হাতে আর কানাকড়িটি রাখলে না। বড়বৌ বলতে গেলে ধমকে জবাব দিত—

সিদ্ধেশ্বরী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, ঠিক আমার দশা আর কি !

নয়নতারা কহিল, তা বৈ কি। বড়বৌকে নন্দ মিত্তির ধমকে বলত, তোমার ভাবনা কি ? তোমার নরেন রইল। তাকে যেমন মানুষ করে উকীল করে দিলুম বুড়ো বয়সে সেও আমাদের তেমনি দেখবে। মনে ভেবো, সে তোমার দেওর নয়, সন্তান। কিন্তু এমনি কলিকাল দিদি, সে নন্দ মিত্তিরের চোখে ছানি পড়ে যখন চাকরিটি গেল, তখন নরেন উকীল—সহোদর ভাই হয়ে দাদাকে টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে পৈতৃক বাড়িটার অংশ পর্যন্ত নীলাম ডেকে নিলে। এখন নন্দ মিত্তির ভিক্ষে করে খায়, আর কেঁদে বলে, স্ত্রীর কথা না শুনেই এখন এই অবস্থা। তবু ত খুড়তুত-জাঠতুত নয়, মায়ের পেটের ভাই !

সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি মেজবৌ।

নয়নতারা বলিল, মিছে নয় দিদি, এ কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে।

সিদ্ধেশ্বরী আর কথা কহিলেন না। তৎপূর্বে এক-একবার মনে হইতেছিল, শৈলকে ডাকিয়া নিষেধ করেন ; এবং কি করিলে যে তাহাদের যাওয়ার বিঘ্ন ঘটিতে পারে, মনে মনে ইহাও নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন ; কিন্তু নন্দ মিত্তিরের দুরবস্থার ইতিহাসে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে বিকল হইয়া গেল। শৈলকে বাধা দিবার আর তাঁহার চেষ্টামাত্র রহিল না।

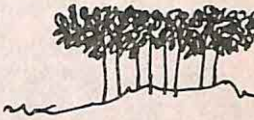
গিরীশ তখন আদালতের জন্য প্রস্তুত হইতে উঠি-উঠি করিতেছিলেন ; রমেশ আসিয়া কহিল, আমি দেশের বাড়িতে গিয়েই থাকব মনে করচি।

কেন ?

রমেশ কহিল, কেউ বাস না করলে বাড়ি-ঘর-দোর ভেঙ্গেচুরে যায়, আর জমি-জায়গা পুকুরগুলোও খারাপ হয়ে যায়। আমারও এখানে কোন কাজ নেই। তাই বলচি।

বেশ কথা ! বেশ কথা ! বলিয়া গিরীশ খুশী হইয়া সম্মতি দিলেন।

ছোটভাইয়ের প্রার্থনার ভিতরে যে কত গৃহবিচ্ছেদ, কতখানি মনোমালিন্য প্রচ্ছন্ন ছিল সে-সংবাদ ভদ্রলোক কিছুই জানিতেন না। তিনি আদালতে বাহির হইয়া যাইবার পরেই শৈল বড়জায়ের ঘরের চৌকাঠের নিকট হইতে তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং সামান্য একটি তোরঙ্গমাত্র সঙ্গে লইয়া দুই ছেলের হাত ধরিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।



আট

গোটা-দুই প্রকাণ্ড খাট জোড়া করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সারারাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ির কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছছাড়া করিতে পারিতেন না। সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, অনেকবার উঠিতে হইত ; কোনদিনই সুস্থ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিতেন না ; অথচ শৈল কিংবা আর কেহ যে এইসকল উৎপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এ অধিকারও কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার এত বড় অসুখের সময়ও জ্যাঠাইমার বিছানা ছাড়া কোন ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিল না। কানাইয়ের শোয়া খারাপ, তাহার জন্য এতটা স্থান চাই, ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েলক্লথের ব্যবস্থা ; বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর-একপ্রকার বন্দোবস্ত ; পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধাবোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত ; খেঁদির বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কিনা, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় চাপা পড়িয়াছে কিনা, এই সব দেখিতে দেখিতে আর বকিতে বকিতেই সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত।

আজ শোবার সময় বিছানায় এতখানি জায়গা যে খালি পড়িয়া থাকিবে, শৈলর যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরীর সে হুঁশ ছিল না। নয়নতারা শতকোটি মাথার দিব্যি দিবার পর তিনি রাত্রে নীচে হইতে খাইয়া ঘরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ শৈলর ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কে যেন তাহার বুকে মুগুর দিয়া মারিল। ঘরে আলো নাই, দরজা দুইটা খোলা—সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে—বাকী বিছানাটা তপ্ত মরুর মত শূন্য খাঁখাঁ করিতেছে। নিজের অপরিসর স্থানটুকুতে তিনি নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন ; কিন্তু সেই দুটি নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া তখন অজস্র তপ্ত-অশ্রুতে তাঁহার মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। বাটীর ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আর কাহাকেও একবিন্দু বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বদ্ধ সংস্কার ছিল, নিজে উপস্থিত না থাকিলেই ছেলেরা নানাপ্রকার ফাঁকি দিয়া কম খায় এবং এ ফাঁকি তিনি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে। দৈবাৎ কোনগতিকে কোন ছেলের খাওয়া চোখে দেখিতে না পাইলে তাহাকে জেরা করিয়া, তাহার পেটে হাত দিয়া অনুভব করিয়া, নানারকমে সিদ্ধেশ্বরী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন—সে কিছুতেই তাহার ন্যায্য আহার করে নাই ; এবং এই অন্যায়টুকু সংশোধন করিতে হতভাগ্য ছেলেটাকে তখনই তাঁহার চোখের উপর দাঁড়াইয়া একবাটি দুধ খাইতে হইত। শৈল ছেলেদের হইয়া মাঝে মাঝে লড়াই করিত ; জবরদস্তি খাওয়ানোর অপকারিতা লইয়া তর্ক করিত ; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীকে আন্তরিক ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা ভিন্ন তাহাতে আর কোন ফল হইত না। সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটার পানে চাহিতেন, তখনই দেখিতেন—সে রোগা হইয়া যাইতেছে। এই লইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা, অশান্তির অবধি ছিল না।

আজ বিছানায় শুইয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দেশের বাটীর বহুবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হয়ত কানাইয়ের খাইয়া পেট ভরে নাই এবং পটল নিশ্চয়ই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, হয়ত তাহাকে তুলিয়া খাওয়ানো হইবে না, হয়ত সে সারারাত্রি ক্ষুধায় ছটফট করিবে,—কল্পনায় যতই এই সকল দুর্ঘটনা তিনি স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, ততই রাগে দুঃখে বেদনায় তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। পাশের ঘরে গিরীশ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অনেক রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে হাত দিয়া ঘুর ভাঙ্গাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, মানলুম যেন, পটলকে শৈল নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়,—তার ওপর তার জোর কি ?

গিরীশ ঘুমের ঝোঁকে জবাব দিলেন, কিছু না।

সিদ্ধেশ্বরী আশান্বিত হইয়া শয্যাংশে বসিয়া বলিলেন, তা হলে আমরা নালিশ করে দিলে যে তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে। পারে কিনা ঠিক বলো ?

গিরীশ অসংশয়ে বলিলেন, নিশ্চয় শাস্তি হবে।

সিদ্ধেশ্বরী আশায় আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, সে যেন হলো ; কিন্তু ধরো পটল। তাকে ত আমি মানুষ করেচি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, চাই কি ভেবে ভেবে তার শক্ত অসুখ হতে পারে, তাহলে হাকিম কি রায় দেবে না যে সে তার জ্যাঠাইমার কাছে থাকুক ? —বেশ ! অমনি তোমার নাক ডাকচে—আমার কথা বুঝি তবে শোননি ! বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর পায়ের উপর সজোরে নাড়া দিলেন।

গিরীশ জাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, নিশ্চয় না।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, কেন নয় ? মা বলেই যে ছেলেকে মেরে ফেলবে মহারানীর কিছু এমন হুকুম নেই। কালই যদি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকীলের চিঠি দিই, কি হয় তা হলে ?—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তরের আশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে স্বামীর নাসিকাধ্বনি শুনিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সারারাত্রি তাঁহার লেশমাত্র ঘুম আসিল না। কখন সকাল হইবে, কখন হরিশকে দিয়া উকীলের চিঠি পাইয়া ছেলের দাবী করিবেন, চিঠি পাইয়া তাহারা কিরূপ ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া কানাই ও পটলকে রাখিয়া যাইবে, এই সমস্ত আশা ও আকাশকুসুমের কল্পনা তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ করিয়া রাখিল।

প্রভাত হইতে না হইতে তিনি হরিশের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, উঠেচ ?

হরিশ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, দেরি করলে চলবে না, এখ্‌খুনি ছোটঠাকুরপোদের নামে উকীলের চিঠি লিখে, দরোয়ান পাঠাতে হবে। তুমি বেশ করে একখানা চিঠি লিখে বলে দাও যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জবাব না পেলে নালিশ করা হবে। হরিশকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করা বাহুল্য। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া, গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপারটা কি বল দেখি বড়বৌ ? বসো, বসো—কি কি নিয়ে গেছে ? দাবীটা একটু বেশী করে দেওয়া চাই। বুঝলে না ?

সিদ্ধেশ্বরী খাটের উপর আসন গ্রহণ করিয়া, দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া তাঁহার দাবীটা বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া হরিশের হর্ষোজ্জ্বল মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপেছ বড়বৌঠান ? আমি বলি, বুঝি আর-কিছু। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তুমি করবে কি ?

সিদ্ধেশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, তোমার দাদা যে বললেন, নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে !

হরিশ কহিলেন, দাদা এমন কথা বলতেই পারেন না। তোমাকে তামাশা করেচেন।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া কহিলেন, এতটা বয়স হলো তামাশা কাকে বলে বুঝিনে ঠাকুরপো ? তোমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে, ছেলে-দুটাকে কাছে আনি। তাই কেন স্পষ্ট করে বল না ?

হরিশ লজ্জিত হইয়া তখন বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, যে এ দাবী আদালত গ্রাহ্য করিবে না। তার চেয়ে বরং আর কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়া জব্দ করা যাইতে পারে। আমাদের উচিত এখন তাই করা।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধভরে উঠিয়া কহিলেন, তোমার উচিত তোমার থাক ঠাকুরপো ; আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এখন মিথ্যে দাবী-দাওয়া করতে পারবো না। পরকালে আমার হয়ে ত আর তুমি জবাব দিতে যাবে না ! তুমি না লেখো, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেনবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনি গে। বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কি একটা কাজে বাজার-খরচের হিসাব লইয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির সরকার গণেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন। সে বেচারা নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল যে, বারো গণ্ডা টাকার উপর আরও দু'টাকা খরচ হওয়াতেই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী এ কর্মে নূতন ব্রতী। তাঁহার নূতন ধারণা—তাঁহাকে নির্বোধ পাইয়া সবাই টাকা চুরি করে। অতএব চক্রবর্তীও যে চুরি করিয়াছে,

তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তর্ক করিতেছিলেন, পঞ্চাশ টাকা যে এক আঁজলা টাকা গণেশ! আমি লেখাপড়া জানিনে বলেই কি তুমি বুঝিয়ে দেবে যে, বারো গণ্ডার ওপর মোটে দুটি টাকা বেশী খরচ হয়েচে বলে এই পঞ্চাশটে টাকা সব খরচ হয়ে গেছে—আর কিছু নেই? আমি কি এতই বোকা!

গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিল, মা, দিদিকে ডেকে না হয়—

নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে? সে আমার চেয়ে বেশী বুঝবে? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমার যা ইচ্ছে তাই করে হিসেব দেবে সে হবে না বলচি। না সে যাবে, না আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে। পোড়ারমুখীকে দশ-বছরের মেয়ে বৌ করে আনলুম, বুকে করে মানুষ করে এত বড় করলুম, এখন সে তেজ করে বাড়ির দু-দুটো ছেলে নিয়ে পালিয়ে গেল। তা যাক। আমিও খবর রাখচি। কানাই-পটলের কোনদিন এতটুকু অসুখ শুনতে পেলে দেখব, কেমন করে সে ছেলে রাখে! তা এখন যাও—দুপুরবেলা মনে করে বলে যেয়ো, এতগুলো টাকা কোথায় কি করলে।—বলিয়া গণেশকে বিদায় দিলেন।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মেজবৌ আসিয়া কহিল, দিদি, বলতে পারিনে, কিন্তু আমিও সংসার চালিয়েচি, টাকাকড়ি হিসাবপত্র সব রেখেচি। ছোটবৌ নেই বলে যে এত ঝঞ্ঝাট তুমি সহ্য করবে, আর আমি বসে বসে দেখব, সে ভাল নয়। আমার কাছে কারো চালাকি করে হিসেবে গোল করবা জো নেই।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, সে ত ভাল কথা মেজবৌ। আমার এই রোগা শরীরে এত হাঙ্গামা কি ভাল লাগে! শৈল ছিল—যেখানকার যত টাকা তার হিসেব করা, খরচ করা, ব্যাঙ্কে পাঠানো—সমস্তই তার কাজ। এসব কি আর আমাকে দিয়ে হয়? বেশ ত, এখন থেকে তুমিই করো মেজবৌ।—বলিয়া সিদ্‌কের চাবিটা কিন্তু নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। নয়নতারা সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়াও লোহার সিন্দুকের চাবিটা আর নিজের আঁচলে বাঁধিতে সমর্থ হইল না। নয়নতারা অত্যন্ত কৌশলী এবং চতুর, অনেকখানি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্তু এই একটা তাহার বড় রকমের গোড়ায় গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরীহ লোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফলভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না। সে শত্রুপক্ষকে যেমন সন্দেহ করিতে শিখে, মিত্রপক্ষের উপরও তেমনি বিশ্বাস হারায়, সুতরাং সিদ্ধেশ্বরী যে-মুহূর্তে ছোটবৌয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠিক সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।



নয়

কোন একটা অভাব লইয়া—তা সে যতই গুরুতর হউক, মানুষ অনন্তকাল শোক করিতে পারে না। সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তাঁহার শয্যার শূন্যতা ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শৈলর ঘরের দিকটা তিনি মাড়াইতেই পারিতেন না, এখন সে বারান্দা স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যান—মনেও পড়ে না। কানাই-পটলের সংবাদ তিনি বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করিবার জন্য অহরহ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, এখন সে উৎকণ্ঠার অর্ধেক তিরোহিত হইয়া গেছে। এইরূপে সুখে-দুঃখে এক বৎসর ঘুরিয়া গেল।

সেদিন হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর কানে গেল যে, দেশের বিষয় লইয়া আজ ছয় মাস ধরিয়া ছোট-দেবরের সহিত তাঁহাদের মামলা চলিতেছে। মকদ্দমা চালাইতেছে হরিশ নিজে। দেওয়ানী ত চলিতেছেই, গোটা-দুই ফৌজদারীও ইতিমধ্যে হইয়া গেছে। খবর শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার মত সংবাদ জানার সুবিধা হইবে না জানিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় হরিশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, বল কি ঠাকুরপো, ছোটঠাকুরপো করচে তোমার দাদার সঙ্গে মামলা?

হরিশ উচ্চ অঙ্গের একটুখানি হাস্য করিয়া কহিলেন, তাই ত হচ্চে বৌঠান।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিলেন, আমার যে বিশ্বাস হয় না, মেজঠাকুরপো। এখনো যে চন্দ্র-সূর্যি উঠচে।

নয়নতারা খাটের একধারে বসিয়া খেঁদিকে ঘুম পাড়াইতেছিল, মৃদুস্বরে কহিল, সে ত উঠচেই দিদি। আর এই ছোট-দেওরকেই তোমরা হাজার হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিতে। সে সব ত তখন যায়নি; যাচ্ছে এখন।

সিদ্ধেশ্বরী দুঃসহ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মকদ্দমা কেন?

হরিশ বলিলেন, কেন! দেখলুম, মকদ্দমা না করে আর উপায় নেই। দেশের বিষয়ই বিষয়। দেখলুম আমরা গেলে আমাদের মণি-হরি-বিপিন-ক্ষুদে এক কাঠা জমি-জায়গা ত পাবেই না—দেশের বাড়িতে হয়ত ঢুকতে পর্যন্ত পাবে না। ধর না বড়বৌ, দেশে যা-কিছু আছে, সে-ই সমস্ত দখল করে বসে গেছে। খাজনাপত্র আদায় করচে, খাচ্চে-দাচ্চে—একটা পয়সা পর্যন্ত দেবার নাম করে না। বিষয় যা-কিছু তা ত দাদাই করেচেন, অথচ দাদার চিঠির একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না—এমনি নেমকহারাম রমেশ। আমিও বাড়ি থেকে তাকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধেশ্বরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তারাই বা ছেলেপিলে নিয়ে যাবে কোথায়?

হরিশ বলিলেন, সে খবরে আমাদের ত দরকার নেই, বড়বৌ।

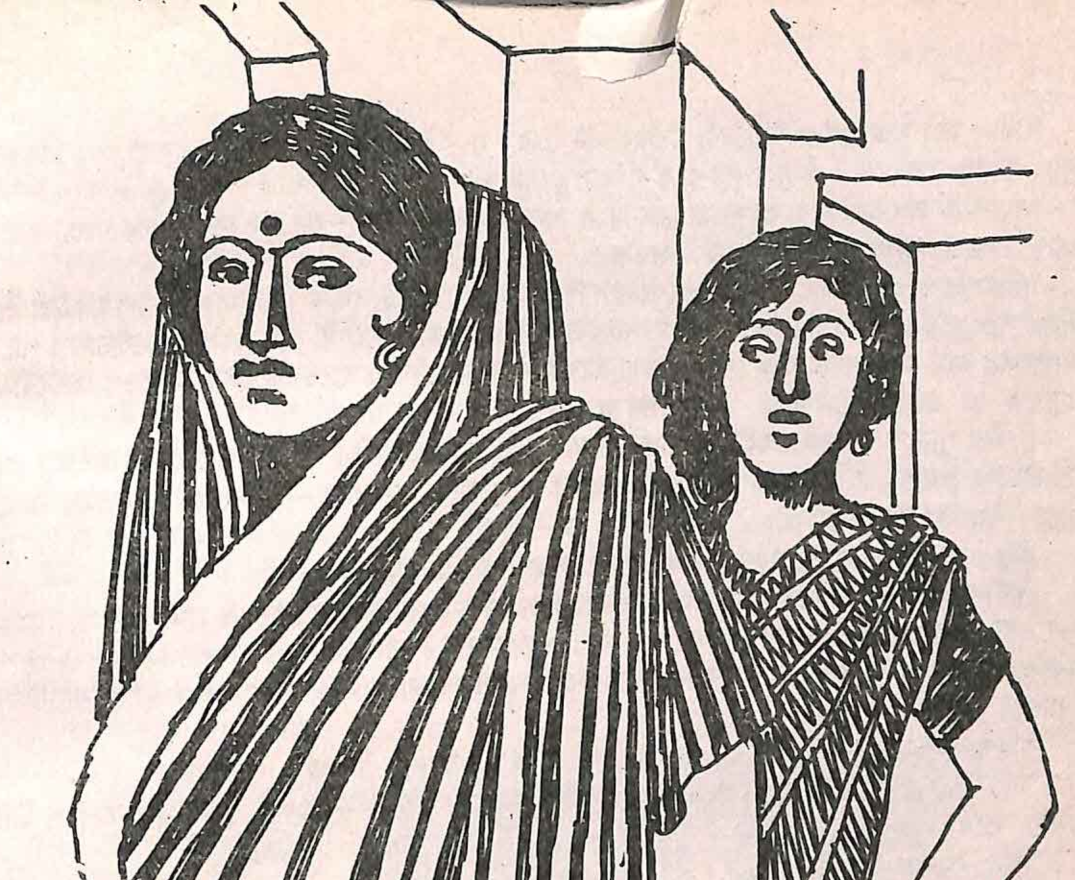
সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদা কি বললেন?

হরিশ বলিলেন, দাদা যদি তেমন হতেন, তা হলে ত ভাবনা ছিল না বড়বৌ। যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, রমেশ তাঁর খেয়ে-পরে, তাঁর টাকায় তাঁরই বিষয় নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েচে, তখনই তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেই জড়িয়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে আমাকে সেটা ফাঁসাতে হয়েচে।

নয়নতারা ফিসফিস করিয়া বলিল, আচ্ছা, ছোটঠাকুরপোই যেন দোষী, কিন্তু আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোটবৌ কি করে এতে মত দিলে, আমরা আর সবাই দুষ্টু বজ্জাত হতে পারি, কিন্তু সে তার বট্‌ঠাকুরকে ত চেনে। তাকে জেলে দিয়ে সে কি সুখ পেত?

সিদ্ধেশ্বরীর আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তথা হইতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ যথারীতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিতেই তাঁহার অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা আজ তাঁহারও চোখে পড়িল। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ কখন জ্বর এল?



সিদ্ধেশ্বরী অভিমানভরে বলিলেন, তবু ভালো, জিজ্ঞাসা করলে।

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! জিজ্ঞেসা করিনি ত কি? পরশুও ত মণিকে ডেকে বললুম, তোর মাকে ওষুধ-টষুধ দিস? তা আজকালকার ছেলেগুলো হয়েছে সব এমনি যে, বাপ-মাকে পর্যন্ত মানে না।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বুড়োবয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর বলো না, পনর দিন হয়ে গেল, মণি-তার পিসির ওখানে এলাহাবাদে গেছে, আর তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে! কখনো যা করেনি, তা কি আজ করবে? —তা নয়, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি এসেচি জানতে, ব্যাপারটা কি? ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা কিসের?

গিরীশ মহা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, সেটা একটা চোর ! চোর ! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে ! বিষয়পত্র সব নষ্ট করে ফেললে । সেটাকে দূর করে না দিলে দেখচি আর ভদ্রস্থ নেই—সমস্ত ছারখার ধ্বংস করে দিলে ।

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা তা যেন দিলে, কিন্তু মামলা-মকদ্দমা ত শুধু শুধু হয় না, টাকা খরচ করা ত চাই ? ছোটঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথায় ?

ইতিমধ্যে হরিশ নামিয়া আসিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাইতেছিলেন, দাদার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন । তিনি জবাব দিলেন—টাকার কথা ত এইমাত্র মেজবৌ বলে দিলেন বড়বৌঠান ! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে হাজার-চারেক নিয়েছিল, সেটা ত হাতে আছেই ; তা ছাড়া, ছোটবৌমার হাতেই ত এতদিন টাকাকড়ি সমস্ত ছিল বুঝেই দেখ না !

গিরীশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে, কিছু কি আর রেখেচে হে হরিশ ! সেটা একেবারে বেহেড লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে ! শুক্রবার দিন কোর্টে এসে বলে—বাড়ি-ঘরদোর মেরামত করতে হবে, পাঁচ শ টাকা চাই ।

হরিশ অবাক হইয়া গেলেন, বলেন কি ? সাহস ত কম নয় !

গিরীশ কহিলেন, সাহস বলে সাহস ! একেবারে লম্বা ফর্দ—এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথাতে হবে ; এটা না বদলালে নয়, ওটা না করলেই চলে না । শুধু কি তাই ! সংসারের অনটন—শীতের কাপড়-চোপড় কিনতে হবে—ধান কিনে, আলু কিনে রাখতে হবে,—এমনি হাজারো খরচ দেখিয়ে আরও তিন শ টাকার দরকার !

হরিশ অসহ্য ক্রোধ কোনমতে সংবরণ করিয়া শুধু কহিলেন, নির্লজ্জ ! তারপরে ?

গিরীশ বলিলেন, ঠিক তাই । হতভাগার একেবারে লজ্জাশরম নেই—এক্কেবারে নেই । এই আট শ টাকা নিয়ে তবে ছাড়লে ।

নিয়ে গেল ? আপনি দিলেন ?

গিরীশ বলিলেন, না হলে কি ছাড়ে ? নিয়ে তবে উঠল যে !

হরিশের সমস্ত মুখখানা প্রথমটা অগ্নিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই ছাইয়ের মত হইয়া গেল । স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা হলে মামলা-মকদ্দমা করে আর লাভ কি দাদা ?

গিরীশ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, কিছু না, কিছু না । নিজের সংসারটা যে চালিয়ে নেবে হতভাগার সেটুকু ক্ষমতাও নেই—এমনি অপদার্থ হয়ে গেছে । শুনি, বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ডা বসিয়ে দিনরাত তাস-পাশা চলচে, আর খাচ্চেন—ব্যাস্ । মানুষ যেমন শিব-স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েচে তাই—বুঝলে না হরিশ ! বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই মাতিয়া উঠিয়া হো হো রবে হাসিয়া ঘর ভরিয়া দিলেন ।

হরিশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন । দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা, আমি একাই দেখচি ।

মাঘ মাসের বাইশে মকদ্দমার দিন ছিল । বিশে গিরীশের এক জ্ঞাতিকন্যার বিবাহে কন্যার পিতা আসিয়া গিরীশকে চাপিয়া ধরিলেন, দাদা, তুমি উপস্থিত থেকে আমার মেয়ের বিবাহ দাও, এই আমার বড় সাধ । তোমাকে একটি দিনের জন্যেও অন্তত দেশে যেতে হবে ।

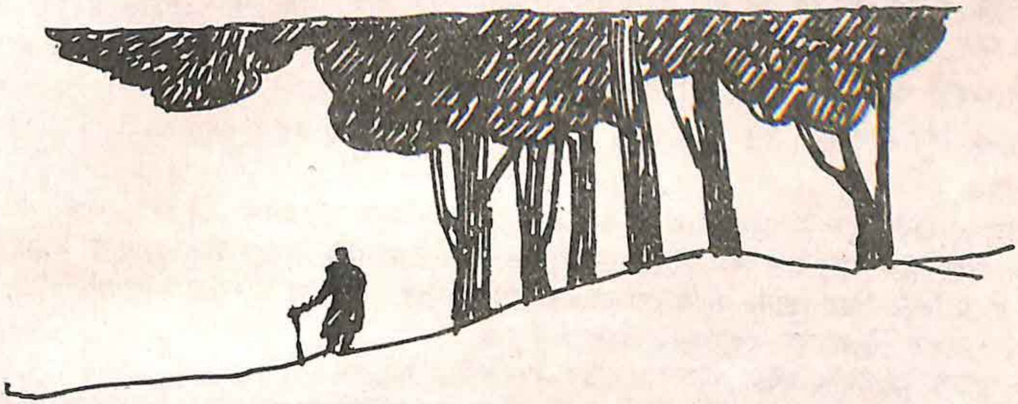
'না' শব্দটা গিরীশের মুখ দিয়া বাহির হইবার জো ছিল না । তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, যাব বৈ কি ভায়া, নিশ্চয় যাব ।

কন্যার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন । কিন্তু এই 'নিশ্চয়' কথাটার বাস্তবিক অর্থ যথাকালে যে কি হইবে, তাহা সবচেয়ে বেশী জানিতেন সিদ্ধেশ্বরী । সুতরাং প্রতিশ্রুতির বিবরণ যদিচ স্বামী বিস্মৃত হইয়াছিলেন, স্ত্রী হন নাই ।

বিশে সকালে গিরীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, বল কি ! আজ যে আমার সেই জয়পুরের মক—

না, সে হবে না । তোমাকে যেতেই হবে । উকীল হয়ে পর্যন্ত ত মিছে কথা বলে আসচে—আজ একটা কথাও রাখো । পরকালের ভয় কি তোমার এতটুকু হয় না ?

গিরীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, পরকাল ? তা বটে—কিন্তু—
না, কিছুতে হবে না, তোমাকে যেতেই হবে। যাও।
অতএব গিরীশকে দেশে যাইতে হইল।
যাইবার সময় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, ছেলে দুটোকে—বলিয়াই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন !
আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, বলিয়া গিরীশ বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি হবে, তাহা স্বামী-স্ত্রীর কেহই বুঝিলেন না। নয়নতারা গা টিপিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিল, ও বাড়িতে কিছু খেতেটেতে বট্‌ঠাকুরকে মানা করে দিলে না কেন ?
সিদ্ধেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ?
নয়নতারা মুখখানা বিকৃত-গম্ভীর করিয়া বলিল, বলা যায় কি দিদি !
সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, সে তুমি পার মেজবৌ। শৈলর গলা কেটে ফেললেও সে তা পারবে না। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।
মকদ্দমার তদবির করিতে দুই-একদিন পূর্বে জেলায় যাইবার জন্য রমেশ ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। শৈল সেখানে ছিল না। সে ঠাকুরঘরের মধ্যে দেহ হইতে তাহার সর্বশেষ অলঙ্কারখানি খুলিয়া ফেলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গলবস্ত্র, যুক্তকরে মনে মনে বলিতেছিল, ঠাকুর আর ত কিছু নাই ; এইবার যেমন করিয়া হোক আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমার ছেলেরা না খাইয়া মরিতেছে, আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কালসার হইতেছেন—
ওরে কেনো ওরে পটলি—



শৈল চমকিয়া উঠিল—এ যে তাহার ভাশুরের কণ্ঠস্বর ! জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিনিই বটে। পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, সেই শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্তি। চিরকালটি যেমনটি দেখিয়া আসিয়াছে, ঠিক তাই। কোন অঙ্গে এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নাই। কানাই পড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল ; পটল খেলা ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। তাহাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।
রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।
গিরীশ কহিলেন, এমন সময়, কোথায় যাওয়া হবে ?
রমেশ কুণ্ঠিত অস্পষ্টস্বরে বলিল, জেলায়—
গিরীশ চক্ষের পলেকে বারুদের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন—হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, তুমি আমার খাবে-পরবে, আর আমরাই সঙ্গে মামলা করবে ? তোমাকে এক সিকি-পয়সা বিষয়-আশয় দেব না—দূর হও আমার বাড়ি থেকে ; এখখুনি দূর হও—এক মিনিট দেরি নয়—এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও—
রমেশ কথা কহিল না, মুখ তুলিল না ; যেমন ছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। দাদাকে সে যেমন ভক্তিমান্য করিত, তেমনি চিনিত। এইসব তিরস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়া সে তখনকার মত মুখ বুজিয়া বাহির হইয়া গেল।
তখন শৈল আসিয়া দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।
গিরীশ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এস, এস, মা এস। সে স্বরে উত্তাপ নেই, জ্বালা নাই—বাহির হইতে

প্রবেশ করিয়া কোন লোকের সাধ্য নাই যে, বলে এই মানুষটাই মুহূর্তকাল পূর্বে ওরূপভাবে চীৎকার করিতেছিল।

গিরীশের নজরে কোনদিন কিছু পড়ে না ; কিন্তু আজ কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্য নৈপুণ্য লাভ করিল। শৈলর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমার গায়ে গয়না দেখচি নে কেন ছোটবৌমা ?

শৈল অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

গিরীশের কণ্ঠস্বর পুনরায় এক এক পর্দা চড়িতে লাগিল—ঐ হতভাগা শুয়ার বেচে খেয়েচে। গয়না কার ? আমার। ওকে আমি জেলে দিয়ে তবে ছাড়ব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাইশে মকদ্দমার দিন অপরাহ্ণবেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া হুগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং ধড়াচূড়া না ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল ; খবর পাইয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু হরিশ সেই যে পাশ ফিরিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, কেহই তাঁহার মুখ হইতে একটা জবাবও বাহির করিতে পারিল না।

মকদ্দমায় যে হার হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই,—দুই জায়ে নিরন্তর বুঝাইতে লাগিলেন—মকদ্দমায় হার-জিত আছেই—তা ছাড়া এখনও হাইকোর্ট আছে, বিলাতে আপীল করা আছে—এরই মধ্যে এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছুমাত্র হেতু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই দুটি স্ত্রীলোকের যে আশা-ভরসা ছিল, নিজে উকীল হইয়াও হরিশের তাহার কণামাত্রও দেখা গেল না।

সিদ্ধেশ্বরী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হরিশের হাত ধরিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, আমি বলচি, তোমাদের হার হবে না। যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি হাইকোর্ট কর। আমি আর্শীবাদ করচি তুমি জিতবেই।

এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বৌঠান, সে হবার জো নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্টই বল, আর বিলাতই বল—কোথাও কোন রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই দাদার নামে খরিদ ছিল। বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি—সর্বস্ব ছোটবৌমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এসেছেন। রেজিস্ট্রি পর্যন্ত হয়ে গেছে। দেশের দিকে মুখ ফেরাবারও আর পথ নেই।

দুই জায়ে মুখোমুখি হইয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়ে রহিলেন।

সন্ধ্যার পর গিরীশ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত। কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকী রাখিল না।

গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন, যে এ-ছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না। হতভাগা নচ্ছার বোম্বেটে, ছোটবৌমার গয়নাগুলো বেচিয়া খাইয়াছে, আর একটু হইলেই বাড়ির ইঁটকাট পর্যন্ত বেচিয়া খাইত—দেশের বাড়ির অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাডুবি হইতে বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন।

শুধু সিদ্ধেশ্বরী একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, ভালমন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে, তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চোখদুটিতে জল তখনও টলটল করিতেছিল ; দুই পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে যার যা মুখে এলো—বলে গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে-কথা আজ যেমন আমি বুঝেচি এমন কোনদিন নয়।

গিরীশ মহা খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, দেখলে বড়বৌ, আমার সবদিকে নজর থাকে কিনা ! রমেশ কালকের ছোঁড়া, সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্ট করে দেবে ! এমনি কায়দা বেঁধে দিয়ে এলুম যে, আর সেখানে বাছাধনের চালাকিটি চলবে না।—বলিয়া কি জানি নিজের কোন্ হাসির কথায় নিজেই হো হো শব্দে হাসিয়া ঘরদ্বার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম ঃ ৬ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২